পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সমকালীন কবিতা (১৯৯১-২০০০)

সময় পরিবর্তমান। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে; দুই দশক অতিক্রান্ত হল ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে উপনীত হল বিশ্বের ইতিহাস। ইতিহাসের এই গতিপথে সমগ্র বিশ্বেই বিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে দেখা দিয়েছে এমন এক কালপর্ব যেখানে কিছুটা হলেও তার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে পূর্ববর্তী সময়ের থেকে। এই পরিবর্তনের কারণরূপে মুক্তবাজার অর্থনীতির অভূতপূর্ব প্রসারকে চিহ্নিত করা যায়। এই প্রক্রিয়া বিশ্বায়ন নামে পরিচিত। এই প্রসারকে যেমন জ্ঞানচর্চার জগৎ এবং বিভিন্ন গবেষণার জগৎ ব্যবহার করতে পেরেছে; তেমনি অনেক বেশি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছে পুঁজিবাদী বাণিজ্যের জগৎ। বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন হয় বাজার। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসার খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় বাজারকে বিশ্ব-বাজারে পরিণত করেছে। ফলত বিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে পৃথিবীর মানুষ মুক্তবাজারের পাশাপাশি বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে হস্তগত করায়, অনেকটাই সমচিন্তা এবং সমসুযোগের একটি পরিসর ও মানসিকতা অর্জন করেছে। এর ফলে স্থান-কালের ব্যবধান লুপ্ত হয়ে সমগ্র বিশ্ব পরিণত হয়েছে একটি গ্লোবাল ভিলেজ বা গ্রামবিশ্বে। স্থান, কাল ও সীমান্তের ব্যবধান বিলোপ করে গ্রামবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে এর অভিঘাত সমান নয়। কারণ সব দেশের সব মানুষ রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। যারা পারে তাদের পক্ষে গ্রামবিশ্বের সদস্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও, যারা সভ্যতার অগ্রগতির সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। গ্রাম শহরের সমান বিকাশ না হওয়ায়, প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের পক্ষে বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করার সুযোগ হয় না, ফলে সমাজে ক্রমশ বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সংকুচিত হয় কর্মসংস্থান, মুনাফা বৃদ্ধি পায়, মজুরি কমে যায়, পুঁজির আস্ফালনে শ্রমের মর্যাদা হানি ঘটে, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির আগ্রাসনে মধ্যমানের দেশীয় কারখানার জিনিসের

চাহিদা কমে যায়, স্থানীয় সংস্কৃতির তুলনার বৈশ্বিক তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব বেড়ে ওঠে। এইভাবে উন্নত দেশগুলি আস্তে আস্তে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের নামে এই পরহন্তা রাজনীতি তথা লুণ্ঠনমূলক বিশ্বায়ন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা জানতে হলে, এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালপর্বটি জানা জরুরি। কারণ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ সেই দেশকে নিজের বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত করে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু **১৯৭৫** খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বাংলাদেশে শুরু হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। একাধিকবার সরকার পরিবর্তন এবং সামরিক শাসনের বেড়াজালে নিষ্পেষিত হয় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধি ও বিকাশ। তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। **১৯৯০** খ্রিস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং তাঁর সামরিক শাসনের পতন ঘটে। গণ-আন্দোলনের চাপে **১৯৯০** খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করলে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকার **১৯৯১** খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরেই এরশাদ-বিরোধী রাজনৈতিক ঐক্যে ফাটল ধরে। **১৯৯০** খ্রিস্টাব্দে এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের আদর্শগত বিরোধ সত্ত্বেও তিনটি প্রধান জোটে সংগঠিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট, বি.এন.পি.র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট এবং ৫ দলীয় বামজোট।[১] কিন্তু এরশাদের পতনের পরেই দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে এই জোট ভেঙে যায়। পরবর্তী তিন-চার বছর বাংলাদেশের অনেকগুলি ছোট ও বড়ো রাজনৈতিক দল বিভিন্ন ধরনের জোট তৈরি করে টিকে থাকবার এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালিয়েছে। অনবরত দলগুলির মধ্যে জোট গঠিত হয়েছে এবং ভেঙেছে। তার

বিস্তৃত বিবরণ এখানে আবশ্যিক নয়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর ১৪৭ জন বিরোধী সাংসদ একসঙ্গে পদত্যাগ করলে দেশে চরম সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙে যায়। সাংবিধানিক সংকটের মুখে পড়ে বি.এন.পি. সরকারের বিশেষ কৌশলে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি দেশে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগসহ বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি এই নির্বাচন বয়কট করার ফলে বি.এন.পি. সরকার গঠন করেও বৈধতা অর্জন করতে পারেনি। একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন দেশে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন দখন করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বি.এন.পি. পায় ১১৬টি আসন। এরশাদের জাতীয় পার্টি ৩২টি আসন দখল করে।[২] দীর্ঘ একুশ বছর পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলকে (জাসদ) নিয়ে ঐক্যমত্যের সরকার গঠিত হয়। এই জোটের পক্ষ থেকে বি.এন.পি.কেও জোট সরকারে আসার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু বি.এন.পি. তা প্রত্যাখ্যান করে। রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই শেখ হাসিনার সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নে বিরোধী দলের সমালোচনার মুখে পড়ে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত দেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ টি আসনের মধ্যে চারদলীয় জোট ২১৬টি আসন পায়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারের ভরাডুবি হয়। তারা মাত্র ৬২ টি আসন লাভ করে।[৩] ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০১ পর্যন্ত মানুষের মনে যে হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম হয়েছিল তাকে কাজে লাগিয়ে বি.এন.পি. নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া। এক দশকের এই রাজনৈতিক বিবর্তনের পাশাপাশি বহির্বিশ্বেও ঘটেছে নানা ঘটনা, পরিবর্তন হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে বি.এন.পি.-জামায়াত জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা

দেয়। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমদ দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ দেশের শাসনক্ষমতা দখন করে।[৪] ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধিকাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা ধরে রেখেছেন।

এই সময় বিশ্বময় গণতন্ত্রায়ন, অর্থনীতির বিশ্বায়ন এবং মুক্ত বাজারনীতির দ্রুত প্রসার, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার নতুন সুর, তথ্যপ্রবাহের অবাধ গতিধারা এবং সুপার হাইওয়ে, ই-মেল ইন্টারনেটের ব্যাপকতার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই যুগে যে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে তা মূলত মেধার, পেশিশক্তির নয়। আন্তর্জাতিক এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে গেলে প্রয়োজন সৃজনশীল চিন্তনের। বাগবিতণ্ডার চেয়ে প্রয়োজন গঠনমূলক কাজ, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার পরিবর্তে প্রয়োজন বিচক্ষণতা। যদিও যুদ্ধ ঠেকানো যায়নি; সন্ত্রাসবাদও। বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ সাতের দশকের মধ্যভাগ থেকে নয়ের দশকের শেষপর্যন্ত যে পথে এগিয়েছে সেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে উল্লিখিত অধিকাংশ গুণের অভাব প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই গণতন্ত্র একান্তই প্রাণহীন। প্রতিমুহূর্তেই দলীয় কোন্দল ও রাজনৈতিক চাপানউতোর গঠনমূলক রাজনীতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম শর্ত হল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। এই দুটি একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু রাজনৈতিক কোন্দল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ক্রমশ দুর্বল করে দিয়েছে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই পুঁজিবাদ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্রকাঠামোয় গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে।

তবে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, বাংলাদেশের জনগণের সমাজজীবনেও বিশ্বায়নের ক্ষতিকারক প্রভাব কম নয়। বিশ্বায়নের যুগে যন্ত্র–প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন। এ-সবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে এসেছে সাইবার যুগ। চিন্তনের ক্ষেত্রে এই যন্ত্র-প্রযুক্তি-আন্তর্জাল একদিকে মানুষকে ভাবনাকে যেমন বিস্তৃত

করে দিয়েছে সারা বিশ্বের তথ্য ও প্রযুক্তি জগতে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের মন সংকুচিত হয়ে গেছে বাস্তবের পারস্পরিক হৃদয় সম্পর্কের দিক থেকে। বাণিজ্যায়নের মুক্তবিশ্ব স্বীকৃত হয়ে গেছে অধিকাংশ দেশে। যদিও বাংলাদেশ তখনও দরিদ্র-পশ্চাৎপর দেশ। তবু সেখানেও দেখা গিয়েছে এই নতুন হাওয়া।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য সত্য হল মুক্তিযুদ্ধের কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মেদূর স্বপ্ন, প্রবল সংঘাত, গভীর আত্মত্যাগ-কোনো কিছুরই সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। তারা চোখের সামনে যে স্বদেশকে দেখেছে, সেই স্বদেশ প্রধানত দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থপর, রাজনৈতিক প্রশাসকদের কুক্ষীগত। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে তরুণদের পক্ষে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক। নিজেদের অস্তিত্ব নিরাপদ রাখা, নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া, নিজেদের ভোগ-সুখের সন্ধান করা—এর বাইরে তাদের আকর্ষণ করেনি সামাজিক জগৎ। তার ফলে বিশ শতকের শেষ দশকের তরুণ কবিদের কবিতায় প্রত্যক্ষ রাজনীতি সচেতনতা অনেকাংশে উপেক্ষিত হয়েছে। কবিতায় এসেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ, ভোগবাদ প্রভৃতি অনুষঙ্গ। কেবল নয়ের দশকের নতুন কবিরা নন; ছয়, সাত, আটের দশকের কবি যাঁরা এই সময়েও তাঁদের লেখনীকে সচল রেখেছিলেন, তাঁরাও কিন্তু সমানতালে এই দশকে কাব্যচর্চা করে গেছেন। বিশ শতকের এই শেষ দশকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নতুন কবিদের মতো তাঁরাও সাইবার দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, বিচ্ছিন্নতাবাদ, একাকিত্বের শিকার হয়েছেন কিন্তু সমকালীন যুগসংকটকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে চাননি। ফলে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক সংকট অনিবার্যভাবে তাঁদের কবিতায় স্থান পেয়েছে। সবমিলিয়ে বিশ শতকের শেষ দশকে যে-সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে সেখানে কয়েকটি প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এগুলি হল—১. রাজনীতি সচেতনতা, ২. আর্থ-সামাজিক সংকট, ৩. নাগরিক ভোগবাদ, ৪. নিঃসঙ্গতাবোধ, ৫. ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি। এই প্রবণতাগুলিকে সামনে রেখে বিভিন্ন কবির কবিতায় কীভাবে সেগুলি পরিস্ফুট হয়েছে তা আলোচ্য অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

১. রাজনীতি সচেতনতা

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের রাজনীতি নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। দীর্ঘ এক দশকের স্বৈরাচারের কবলমুক্ত হয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার, বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে বি.এন.পি। প্রথমবার বাংলাদেশ পেয়েছে মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। এক দশক অন্ধকার সময়ে নিমজ্জিত থাকার পর বাংলাদেশের জনগণ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু রাজাকারদেরকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে যারা বাঙালির কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে, বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নয় মাস ধরে পদদলিত করার চেষ্টা চালিয়েছে প্রতিমুহূর্তে, তারাই শাসকের আসনে বসলে পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ—এমন আশঙ্কা করেছিল বাংলাদেশের জনগণ। জনগণের এই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষমতায় বসলেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাকে কঠোর হাতে দমন করতে পারেননি। সে-কারণে সন্ত্রাস, হত্যার মতো ঘটনায় দেশের জনগণ দুঃসহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। **১৯৯২** খ্রিস্টাব্দের প্রায় পুরো সময় জুড়েই বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটেছে। ৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আততায়ীয় গুলিতে নিহত হয় আওয়ামী লীগের ছাত্রশাখার কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জমান বাদল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা শহরে গাড়ি ভাঙচুর ও আগুন লাগানো হয়। ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিহত হয় ছাত্রনেতা মঈন হোসেন রাজু। ৫ জুন হত্যা করা হয় হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্র শরিফ আহমদ চৌধুরীকে। কেবল ছাত্ররা নয়, সারাবছর ধরে চলা সংঘর্ষে অসংখ্য সাধারণ মানুষ নিহত হন। যার অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়েছিল রাজধানী ঢাকায়। এককথায় **১৯৯২** খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহানগরী হয়ে উঠেছিল সন্ত্রাসের রাজধানী। চরম সংকটে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল মধ্যবিত্ত সমাজ। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষ। এই রকম পরিস্থিতিতে কবি বিমল গুহ প্রত্যক্ষ করেছেন ক্রোধের আগুনে জ্বলা ঢাকা শহরকে।

শ্বাপদের নারকীয় উল্লাসের মধ্যেই কবি অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সাধারণ মানুষের ছুটোছুটি। কবির মনে হয়েছে কেবল ঢাকা নয়, সমগ্র বাংলাদেশ যেন পঙ্গু গণতন্ত্রকে আশ্রয় করে অন্ধকারের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে—

> ‘বিংশ শতাব্দীর প্রান্তে কলঙ্ক চিহ্নিত হয়
> আমার বসতি
> কোথায় দাঁড়াবে গিয়ে শান্তিপ্রিয় দেশের মানুষ
> শ্বাস নেবে মুক্ত হাওয়ায়।
> হতবাক জনতার সারি এখনো দাঁড়িয়ে আছে
> ধ্বংসের কিনারে,
> আগামী প্রজন্ম কাঁদে মুখ থুবড়ে একাকী রাস্তায়।’[৫] (ক্রোধের আগুন)

কেবল বিমল গুহ নয় একাধিক কবির কবিতাতেই ধরা পড়েছে গণতন্ত্রের এই অবক্ষয়—

(১) ‘আহা গণতন্ত্র
একালের প্রতারণার ফাঁদ
মানুষের আশা যায় আনন্দ যায়
আর সব পাওয়া গেছে বলে শোষকের উৎসবে

বিষণ্ন পাইনের মতো নুয়ে পড়ছে মানুষ
মানুষের ভালোবাসা সাহস স্বাধীনতা।’[৬] (দৃশ্য)

(২) ‘বুকভরা গর্ব নিয়ে
গণতন্ত্রের ভাগাড়ে ভাগাড়ে
নিজেদের লিপ্ত রেখে দেখেছি নির্বাক
‘এক দশকে সংঘ ভেঙে যায়’
আমাদের সব সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে
নুলো ভিখিরির মতো

করজোড়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে;
ভাই, ওকে খালি হাতে যেতে দিও না।'[৭] (আমরা নব্বই-এর সন্তান)

গণতন্ত্রকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি শামীম কবীর। চাঁদের আলো মনোহরণকারী হলেও এই আলো অকৃত্রিম নয়, কারণ চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই, সে সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। জলে তার প্রতিচ্ছবি লক্ষ করে মানুষ হাতের নাগালে পাওয়া চাঁদকে ধরতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়। কারণ তা চাঁদ নয়, চাঁদের প্রতিবিম্ব। তেমনি নয়ের দশকে যে গণতন্ত্রকে নিয়ে মানুষ উল্লসিত, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস প্রকাশ অর্থহীন বলেই মনে করেন কবি। কারণ এই গণতন্ত্র চাঁদের প্রতিবিম্বের মতোই মিথ্যা মায়া নিয়ে জনগণের জীবনে হাজির হয়েছে। সূর্যের আলোর প্রখরতা এতে নেই। কারণ এই গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশের রাষ্ট্রশক্তি। বিপন্ন এই গণতন্ত্রকে চাঁদের রূপকে ব্যঙ্গ করেছেন কবি—

'যে চাঁদ মাস্তলে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গ্যালো
যে চাঁদ সাগরে টুকরো টুকরো হ'য়ে
ঝ'রে পড়লো
যে চাঁদ সমুদ্রের নিচে শুয়ে আছে
খণ্ড বিখণ্ড হয়ে
সে চাঁদ তুমি নও
তুমি তার প্রেতাত্মা'[৮] (ও চাঁদ)

নয়ের দশকে বাংলাদেশের সরকার নানাভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। রাশেদ খান মেননকে হত্যার চেষ্টা, সেই কণ্ঠরোধেরই একটি দৃষ্টান্ত। রাশের খান মেনন বাংলাদেশের একজন বামপন্থী সংশোধনবাদী ধারার নেতা ছিলেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংসদ সদস্য হন। এই সময় তিনি ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মেনন এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে দেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় থেকে তিনি বি.এন.পি. সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা শুরু করেন। বি.এন.পি.-জামায়াত সখ্য, জামায়াত শিবিরের সাম্প্রদায়িক উস্কানি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি আক্রমণ, সরকারের আপসমূলক বৈদেশিক নীতি, মুক্তবাজার নীতির বিরোধিতার পাশাপাশি তিনি কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ করতে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এমনকি রাজাকারদের বিচারের দাবিতে গঠিত 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র আন্দোলন সংগঠিত করতেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর এই গঠনমূলক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই দেশের ক্ষমতালোভী স্বার্থপর শ্রেণিকে খুশি করতে পারেনি। তাই তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অগাস্ট তাঁকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তিনি প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু হয়। কবি আবিদ আজাদের কবিতায় ধরা পড়েছে এই গণ-বিক্ষোভের চিত্র—

> 'মেনন গুলিবিদ্ধ: স্তম্ভিত বাংলাদেশ: শতাব্দীর অন্তিম দশকে
> সন্ত্রাস আর হত্যাই আজ শেষ কথা মনে হয়।
>
> মেননের বুলেটবিদ্ধ বুক: গুমরে উঠছে হাহাকারে আর্ত বাংলাদেশ
> মেননের বুলেটবিদ্ধ বুক: নুয়ে পড়ছে লজ্জায় আমাদের পতাকা
> মেননের বুলেটবিদ্ধ বুক: রক্তে আবার ভিজে গেল আমাদের স্বাধীনতা।'[৯]
> (রাশেদ খান মেনন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর)

এই ঘটনায় কবি রোগগ্রস্ত রাজনীতির দিকেই আঙুল তুলেছেন। যে রাজনীতি মৃত্যু ও বুলেট ছাড়া অচল, সেই রাজনীতি জনগণের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করেন কবি। রাজনীতির এই হিংস্রতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা আজ মূল্যহীন, গণতন্ত্র দেউলিয়া

হয়ে পড়েছে গণতান্ত্রিক দেশেই। সে-জন্য রক্তপায়ী সমাজতন্ত্রে রাশেদ খান মেননের ব্যক্তি আন্দোলনকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে মৌলবাদী শক্তি। প্রতিমুহূর্তে মানুষের স্বপ্নকে রুটি ও ভাতের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ভেঙে যাওয়া স্বপ্নকেই আঁকড়ে ধরে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন বাংলাদেশের মানুষ, কবিরাও। তাই রাশেদ খান মেননের গুলিবিদ্ধ জখম বুকের মধ্যে থেকেই কবি নতুন মেনন হিসাবে জন্ম নিতে চেয়েছেন। গুলিবিদ্ধ ঝাঁঝরা স্বপ্নের মধ্যেই সন্ধান করেছেন নতুন দিনের আলো। এই লড়াইয়ে মেননই তাঁর পথ প্রদর্শক।

গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসলেও খালেদা-সরকারের প্রশাসনিক পরিমণ্ডল ত্রুটিমুক্ত ছিল না। কারণ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকার কারণে বি.এন.পি., জামায়াতে ইসলামী দলকে সঙ্গে নিয়েই জোট সরকার গঠন করেছিল। এই জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করার চেষ্টা চালিয়েছে। এমনকি সমগ্র আটের দশক জুড়ে দলটি এরশাদকে সমর্থন জুগিয়ে এসেছে। এমন একটি দলকে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য সরকারে অন্তর্ভুক্ত করায়, শুরুতেই বি.এন.পি. তাদের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলেছিল। জামায়াতে ইসলামী দল ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর রাজাকার গোলাম আযমকে প্রকাশ্য সভায় আমীর ঘোষণা করে। এই ঘটনায় বাংলাদেশের রাজনীতি নতুন পথে মোড় নেয়। কারণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় গোলাম আযম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরো সময়টা জুড়েই এই রাজাকার ও আলবদর বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানে খুন-ধর্ষণ-লুঠপাট চালায়। সঙ্গত কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের চোখে গোলাম আযম একজন রাজাকার এবং বাংলাদেশের শত্রু। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এবং গোলাম আযম বি.এন.পি. সরকারের শরিক হওয়ার কারণে বাংলাদেশের জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কবি মিহির মুসাকীর কবিতায় ফুটে উঠেছে এই ক্ষোভের কথা—

‘বিধ্বস্ত শালিকের গায়ে ভেঙে পড়ে অলস দুপুর

কথারা উড়ন্ত

জলপাই সূর্য পরিযায়ী হলে

অন্য কেউ ক্ষমতার গান

একই মঞ্চে ঘুরেফিরে নানা কুশীলব।'[১০] (পোকার উত্থান)

কিন্তু গোলাম আযমসহ যুদ্ধপরাধীদের মতো কুশীলবদের বাংলাদেশের মানুষ সহজে মেনে নেননি। তার প্রমাণ হিসাবে দেখা যায় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি গোলাম আযম ও তাঁর সহকর্মীদের বিচারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'। এই কমিটির আহ্বায়িকা ছিলেন শহিদ জননী জাহানারা ইমাম। একই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি তৈরি হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। ১৭ মার্চ গঠিত হয় গণ-আদালত।[১১] এই আদালত ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তার রায়ে গোলাম আযমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। কিন্তু খালেদা-সরকার এই কমিটির রায়কে বর্জন করে, এবং ঘাতক নির্মূল কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এই ঘটনায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনেকটাই যুক্তিগ্রাহ্য। কারণ স্বাধীন রাষ্ট্রের আইন-আদালত এবং জনগণের রায়ের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে উপেক্ষা করে, আবেগের ওপর ভর করে, একটি কমিটি কখনই কোনো মানুষকে প্রাণদণ্ড দিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে সরকার এই কমিটির রায়কে মান্যতা দেয়নি। কিন্তু দেশের মানুষের আবেগ জড়িয়ে থাকার কারণে ঘাতক নির্মূল কমিটি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ গণ-আদালতের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি' ঢাকায় সমাবেশের আয়োজন করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। কমিটি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ২৭ মার্চ জাহানারা ইমাম, কবি বেগম সুফিয়া কামালকে চেয়ারম্যান করে 'গণ-তদন্ত কমিশন' গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল সমাবেশে গোলাম আযম ছাড়া নতুন করে আটজনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করে তাদেরকে যুদ্ধপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়।। প্রকাশ্য সমাবেশে জাহানারা ইমাম এই আটজনের

বিরুদ্ধে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঘটনায় সে-দিনের জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু গোলাম আযমসহ যুদ্ধপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্য জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মানুষ রাজাকার ও বি.এন.পি.র গোপন যোগসূত্রকে সত্য বলে মেনে নিতে শুরু করেন। এই রকম পরিস্থিতিতে কবি ফারুক আলমগীর লক্ষ করেছেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও দেশের মধ্যে থেকে দেশদ্রোহীদের নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ থেকে শুরু করে ১৯৯০ পর্যন্ত যতবারই রাষ্ট্রপক্ষ বাংলাদেশের জনগণকে পদানত করার চেষ্টা করেছে ততবারই বাংলাদেশের জনগণ জোটবদ্ধভাবে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে গোলাম আযমদের মতো যুদ্ধপরাধীদের বিরুদ্ধে সরকারের 'ধীরে চলো'-নীতি জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই রকম পটভূমিতে কবি ফারুক আলমগীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনের মাধ্যমে দেশবাসীর মনোভাবকে তুলে ধরেছেন—

'জনতার চিৎকার ছাপিয়ে হ্রেষা রবের
মধ্যেই আমার বিহ্বল ক্যামেরা
তোমার গলাবন্ধ কোটের উপরে উঠতেই
তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে অভিমানে!

সোহরাওয়ার্দি উদ্যান জ্বলছে ধিকিধিকি
গনগনে দুপুরে তখন মুক্তিযোদ্ধা হন্তারকের ফাঁসির দাবীতে।'[১২] (মধ্যাহ্নে অভিমানহত মুক্তিযোদ্ধা)

এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কবি আসলে শাসকের পক্ষপাতমূলক নীতিকেই আক্রমণ করেছেন। যে-সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা নিজেদের জীবন বাজি রেখে একাত্তরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, নয় মাস ধরে ঘাতকবাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জন করেছিলেন বাংলাদেশ, তাঁদের সামনেই দেশের শাসক, সে-দিনের শত্রুদের সঙ্গে আপসনীতি নিয়েছে। সরকারের এই দ্বিচারিতা মুক্তিযোদ্ধাদের যে

মানসিক ধাক্কা দিয়েছে তা বোঝানোর জন্যই কবি 'অভিমান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি 'ধিকিধিকি' শব্দ ব্যবহার করে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সরকার না চাইলেও সাধারণ মানুষ এই সমস্ত যুদ্ধপরাধীদের বিরুদ্ধে তাঁদের ধারাবাহিক আন্দোলন যেকোনো মূল্য চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। তাঁদের সেই আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব বোঝাতে কবি সচেতনভাবেই ধিকধিক আগুনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ গোলাম আযম গ্রেফতার হয়ে কারারুদ্ধ হন। শুরু হয় তাঁর নাগরিকত্বের মামলা। তবে গোলাম আযমের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ায় বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়ায়। দেশের রাজনীতি জামায়াত নেতা গোলাম আযমের বিচার ও নাগরিকত্বের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। গোলাম আযমকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের দুই বিচারপতির পরস্পরবিরোধী মন্তব্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। বিচারপতি ইসমাইলউদ্দীন সরকার তাঁর রায়ে বলেন যে, গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্য নন। কিন্তু বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী গোলাম আযমকে বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক বলে রায় দেন। এর ফলে তৃতীয় বিচারক আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তৃতীয় বিচারপতি গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে সিদ্ধান্ত নেন এবং বলেন গোলাম আযম রাজাকার নন। বিচারপতিদের এই পরস্পবিরোধী রায়ে দেশের বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে। কবি হাসানআল আবদুল্লাহ এই ঘটনায় দেশের বিচারব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমণ করেছেন—

'হাত নেই, পা-ও নেই, আছে শুধু মাথাদের শোক
ছিঁড়ে নেয়া ওইসব জনগণতান্ত্রিক ব্যালট
আদালতে উঠে আসে। বিকৃত মুখোশ
পরা কেউ কেউ রায় দেয়: হাড়েরই দোষ।'[১৩] (পর্দা সরে গেছে)

মূলত দিশাহীন কর্মসূচি গ্রহণ এবং শাসনক্ষমতার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় খালেদা জিয়ার আমলে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ইস্যুভিত্তিক জোট গঠনের

প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই সময় গণতন্ত্রী পার্টি, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণ আজাদী লীগ একত্রে 'প্রগতিশীল গণঐক্যজোট' গঠন করে। গোলাম আযম ইস্যুতে আওয়ামী লীগ সর্বদলীয় ঐক্যজোটে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টিকে সঙ্গে নিয়েই ত্রিদলীয় জোট গঠন করে এবং খালেদা জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করে। আওয়ামী লীগ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতিতে আস্থাশীল হলেও জামায়াতে ইসলামীর মতো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গঠন করেছিল কেবলমাত্র ক্ষমতা লাভের জন্য। খালেদা-সরকারের দুর্নীতিকে সামনে রেখে তারা দেশে একটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গড়ার আবেদন জানায়। ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই ত্রিদলীয় জোট ধারাবাহিক হরতাল, অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন দেশে অবাধ, শান্তিপূর্ণ সপ্তম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ। ক্ষমতা দখলের এই রাজনৈতিক কৌশলকে প্রেমের মোড়কে উপস্থাপন করেছেন কবি টোকন ঠাকুর—

'আজ সারাদিন বৃষ্টি, ভিজে যায় অহেতুক হিস্ট্রি...হারি হারাই
হাওয়ারা তখন সরকারি দল, আমি বিরোধী দল, কীভাবে দাঁড়াই!
তাই, শুয়ে শুয়ে শুধু তুমুল ভেজেছি কবিতা, জীবন, নারী-
সেখানে সংঘাত চলছে, হচ্ছে মিলনের দ্বন্দ্ব....ইস্যু :
কেন থাকবো তোমাকে ছাড়াই?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি সামর্থ্য রাখে; এই দ্বন্দ্ব মেটাবার?'[১৪] (মিলনের দ্বন্দ্ব)

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন সংকটের জন্ম হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত দেশের ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি. একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ কোনো বড় রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ না করায় বি.এন.পি. সরকার গঠন করলেও তা বৈধতা পায়নি। আওয়ামী

লীগসহ সমস্ত বিরোধী দল এই অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশে অচল অবস্থা চলতে থাকে। দেশের সমস্ত সরকারি অফিস, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সড়ক এবং নৌ পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত মার্চ মাস জুড়ে বিরোধীরা তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি জারি রাখে। এই সময় পুলিশি তাণ্ডবে বহু মানুষ নিহত হয়, আহত হয় সহস্রাধিক।[১৫] এই রকম দমবন্ধ পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে কবিতায়—

(১) ‘এ-রকম দুঃসময় কখনো আসে নি
এই জনপদে, যখন নিজেরা নিজের রক্ত-মাংস
খায় শকুন চিলের মতো, আবার আড়ালে
শান দেয় ছুরিতে এমন সুবেশধারী
চুমু খেতে গিয়ে ঠোঁটের ভিতরে ঢালে বিষ!’[১৬] (ডেড-লাইন ঢাকা, মার্চ ’৯৬)

(২) ‘এখন শকুন দেখি, অনেক শকুন।
আমাদের আশেপাশে সুনসান বসবাস,...
সুযোগ পেলেই
তুলে নেয় অর্জিত সভ্যতা
ওদের ধারালো ঠোঁটে।
চোখ ঘোরালেই এখন শকুন দেখি।’[১৭] (শকুনেরা ভালো আছে)

দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলেও বেগম খালেদা জিয়ার সরকার বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি। সে-জন্য বি.এন.পি.র ক্ষমতা লাভের পর থেকেই নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশে আন্দোলন চলতে থাকে।[১৮] এর মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলন যেমন ছিল, তেমনি সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনাও অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তুলতে ভূমিকা নিয়েছিল। কারণ ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও বি.এন.পি. সরকার জনজীবনের বিবিধ সমস্যা সমাধান করতে

পারেনি। বি.এন.পি সরকারের আমলে দেশে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ইতিবাচক হারে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থনীতি ক্রমশই শ্লথগতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। হাজার-হাজার কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন বেড়েছে। শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষকরাও আর্থ-সামাজিক সংকটের মুখে পড়েছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সার সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সারের দাম সাধারণ কৃষকের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় একাধিক কৃষক আত্মহত্যা করে, সরকারি কেন্দ্র থেকে কৃষকরা সার লুঠ করে, একাধিক জায়গায় সারের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল উপলক্ষে কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ২৯ মার্চ রংপুরে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ কাজের দাবিতে ভুখমিছিল বের করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি সারা দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ সরকারের কাছে তাঁদের মৌলিক দাবি জানাতে ঢাকায় সমাবেশ করেন। জনগণের যে-সমস্ত দাবিকে কেন্দ্র করে বি.এন.পি. ক্ষমতায় এসেছিল তা পূর্ণ না হওয়ায় সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মানুষ এই সমাবেশে যোগদান করেছিলেন। কবি শামীম কবীর যেন নিজেই এই সমাবেশে সর্বহারার প্রতিনিধি হয়ে সমাজের ঈশ্বররূপী রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন—

> ‘ঈশ্বর হে—দ্যাখো
> আমার পেছনে এই হাড্ডিসার মানবের সুদীর্ঘ মিছিল
> ভীষণ ক্রুদ্ধ, আর প্রতিশোধস্পৃহা ওদের সমগ্র শরীর বিন্দুতে
> কী রকম গনগনে নরকের মতো দ্যাখো, তোমাকেও দেবে না রেহাই।
> ঈশ্বর হে কোন দণ্ড দেবে? পারো তো পালাও!’[১৯] (রক্ত)

কিন্তু পালাতে বললেই রাষ্ট্রের রাশ কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ক্ষমতা থেকে সরে যায় না। সমাজকে এরা শোষণ করতেই ব্যস্ত। তাদের ক্রমাগত শোষণের ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়েছে। এমনই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কবি আবিদ আজাদ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস স্মৃতিচারণ করেছেন। যে-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল একাত্তরের মার্চ মাসে, চলেছিল নয় মাস ধরে। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জয়লাভ

করেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু বদলায়নি দেশের মানুষের অবস্থা। কথা ছিল মানুষ সুখে থাকবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরবে। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। তাই ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দেও স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত মানুষ খুন হয়, ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয় মেধাবী ছাত্রের দেহ। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় প্রতিবাদী মজদুর। খেতে না পেয়ে আত্মহত্যা করে কৃষক পরিবার। এই গণতন্ত্র বাংলাদেশের মানুষ চাননি। স্বাভাবিকভাবে জনগণের প্রতি সরকারের এই বিশ্বাসভঙ্গের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে কবিতায়—

(১) ‘স্বাধীনতার নামে বারবার কেবল বদল হয়েছে মানচিত্র
স্বাধীনতার নামে বারবার কেবল বদল হয়েছে পতাকা
কিন্তু তারপরও নিরন্ন মানুষের মিছিল থেকে চিমনির ধোঁয়ার মতো
উঠেছে একই আওয়াজ

‘দুনিয়ার মজদুর এক হও, এক হও, হাতে নাও হাতিয়ার...
এ আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।’
আমি কি বুঝি না এক রক্তপায়ী শত্রুর খপ্পড় থেকে বিপন্ন শিকার
হয়ে আবার পড়েছি
গিয়ে আরেক রক্তপিপাসু শত্রুর কবলে?’[২০] (আমার অক্ষমতার গল্প)

(২) ‘তুমি ভেবেছিলে গণঅভ্যুত্থান খুব সহজ একটা কাজ
তুমি ভেবেছিলে মুক্তিযুদ্ধ করে হাত পেকেছে তোমার
জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে শিখেছো
তাই শ্রেণি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে জিতবে
ঘরের সঙ্গে বাহির গোলমাল পালিয়ে ফেলেছো
বাইরের শত্রুর সঙ্গে ঘরের শত্রু...’[২১] (এক মধ্যবিত্ত
তরুণের সান্ত্বনা পদ্য)

(৩) 'কথা ছিলো স্থিরতা আসবে ফিরে নগরে ও গ্রামে;
মানুষের মুখ দেখে বোঝা যাবে : আর চিন্ত নাই-
সুসময় এসে গেছে বাঙলার প্রতি ঘরে-ঘরে।
কথা ছিলো গণতন্ত্র মানুষকে দেবে
দু'টো ডাল-ভাত, স্বস্তি, ঘুমোবার নিশ্চিন্ত আশ্রয়-'[২২] (কথা ছিলো)

(৪) 'তবু যদি বিজয়কে দেখতাম দেখতাম না শকুনেরা
কালো পাখসাটে নামে পালে পালে, দেখতাম না
নেকড়ের থাবাগুলো, পিশাচের চোখ
শুনতাম দিক জুড়ে কাকজ্যোৎস্নায় কৃষকের গান
শ্রমিকের কোলাহল, শিক্ষার্থীর বই পড়া....
আমি বিজয়কে দেখিনি
যদিও তার কিংবদন্তি শুনেছিলাম-
বিজয় কোথায় গেল? আমাকে –দেখাও।'[২৩] (আমি বিজয় দেখিনি)

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশে গঠিত প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। কারণ বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাংলাদেশের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। শেখ হাসিনা তাঁরই কন্যা। তিনিও বঙ্গবন্ধুর মতো বাংলাদেশের জনগণকে আপন করে নেবেন এই বিশ্বাস বাংলাদেশের মানুষের ছিল। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি বি.এন.পি. দেশের ষষ্ঠ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও সরকারকে বৈধতা দিতে পারেনি। এই সময় থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বি.এন.পি.কে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করে। দেশের মানুষ শেখ হাসিনার

আন্দোলন কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর ছায়া লক্ষ করে তাঁকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। এই প্রত্যাশা ধরা পড়েছে ময়ুখ চৌধুরীর কবিতায়—

'আপাত নীরব জলে
তোমার ফেরার পথ চেয়ে দিন গুনেছি অনেক;
এ জন্মে আরেক রূপে এসেছো জননী।
চিনেছি চিনেছি দেবী, ভুল করিনি।
চারিদিকে কতো ভক্ত, লাল রক্ত, কালো ধোঁয়া, কালো ভবিষ্যৎ;
একমাত্র তুমি সৎ, তুমি ছাড়া বলি আর কাকে!'[২৪] (আমার সন্তান যেন)

বলাবাহুল্য কবির এই প্রত্যাশা বিফল হয়নি। **১৯৯৬** খ্রিস্টাব্দের **২৩** জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যমত্যের সরকার গঠন করে। এই দিনটি ছিল আওয়ামী লীগ-এর কাছে ঐতিহাসিক দিন। দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছিল। **১৯৭৫** খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল। এর পর দীর্ঘ একুশ বছর ধরে সেনানিবাস থেকেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালিত হয়েছে। অবশেষে **২৩** জুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী দল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে রাষ্ট্রক্ষমতা সেনানিবাসের বাইরে আসে। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের এই মোহ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি।

১৯৯১ থেকে **১৯৯৬** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বি.এন.পি. সরকার বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ও লুটপাঠের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষে শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, নারী, ছাত্রসহ অসংখ্য মানুষ নিহত হয়েছেন। সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং দুর্নীতিকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমে **১৯৯৬** খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতায় আসার জন্য আওয়ামী লীগ এরশাদের জাতীয় পার্টি, এবং গোলাম আযম-এর জামায়াতে ইসলামী পার্টির সঙ্গে জোট করেছিল।

এখানেই আওয়ামী লীগের আদর্শহীন ক্ষমতালোভী মুখোশটি স্পষ্ট হয়ে যায়। নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনে আওয়ামী লীগের আন্দোলন ছিল এরশাদ ও তাঁর জাতীয় পাটির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অথচ ক্ষমতায় আসার জন্য সেই এরশাদ ও তাঁর জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট গড়েছিল তারা। এমনকি যে গোলাম আযম ইস্যুতে আওয়ামী লীগ বি.এন.পি. সরকারের সমালোচনা করেছিল, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, সেই জামায়াতে ইসলামীকে নিয়েই তারা সরকার গঠন করেছিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে আওয়ামী লীগের কাছে দেশের জনগণের আবেগের চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ মুখ্য ছিল। শুধু তাই নয় আওয়ামী লীগের আমলেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নতি ঘটেনি। এই সময় অবিরাম বিদ্যুৎ সংকট এবং শেয়ার বাজারের পতনের ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিম্নগামী হওয়া শুরু করে। শেখ হাসিনার আমলেও জনগণের মৌলিক দাবি-দাওয়াগুলি অপূর্ণই থেকে যায়।[২৫] সমগ্র নয়ের দশক জুড়েই শাসকের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেনি। ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি কবিদের ব্যঙ্গোক্তি উঠে এসেছে এভাবে—

(১) ‘রক্তচোষা জোঁক তুমি গদি ছেড়ে নেমে যাও আজ
মেটাতে পারো নি কেন আমাদের মৌলিক চাহিদা?
অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা আর বেকারের কাজ,
সামান্য এসব দিতে রাবণের মতো করো দ্বিধা।’[২৬] (আমি সেই মাতাল যুবক ৫)

(২) ‘তুমি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নও
তুমি পক্ষপাত ভীষণ পক্ষপাত
তুমি ভীষণ অসুষ্ঠু
আর তুমি অবাধ নও
গণতন্ত্র মনে আমি যেই আলিঙ্গণ করি
তুমি রানীতান্ত্রিক, সহসা মিশে যাও

আমার চোখের বাল্বে'[২৭] (রানীতান্ত্রিক)

(৩) 'ঘুরে ফিরে সেই পুরানো জোয়ারে তুমি
সমর্পিত হলে?— যে জলে দুর্নাম প্রায়
প্রান্তবাসী নারীর সমান?
সেই রৌদ্রে রুচি হলো?— এই সেই রোদ
যে রোদে তোমার স্যাঁতসেঁতে কাপড় শুকোতে হয়!'[২৮] (পয়ারেই করো
ধারাস্নান)

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী এক সমাবেশে শিল্পনীতি, আইনশৃঙ্খলা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের সাফল্য তুলে ধরলেও বাস্তবে যে অসঙ্গতি থেকে গেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১১ জুলাই। ঐদিন কৃষক সমিতি ও ক্ষেতমজুর সমিতি, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সমস্যা নিয়ে সরকারের কাছে ১৫ দফা দাবি পেশ করে যেখানে ভূমি ও কৃষি সংস্কার, পূর্ণাঙ্গ কৃষিনীতি ঘোষণা, স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়া, খাসজমি বিতরণ, ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়, সমালোচনা করা হয় মুক্ত বাজার অর্থনীতিরও। অন্যদিকে ১ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনসহ ছয়টি সংগঠন পাট, ধানসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোসহ একাধিক দাবির কথা জানিয়ে সমাবেশের আয়োজন করে। এই সমস্ত সংগঠনের দাবিগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় আওয়ামী লীগ সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের সাফল্য তুলে ধরলেও কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের ন্যায্য দাবিগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে, তাঁদের সামনে কেবল স্বপ্নের ফানুস রচনা করা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিদানকে ব্যঙ্গ করেছেন কবিরা—

(১) 'একটু আগেও কাক ছিল ডাহা রাজনীতিবিদ;
এখন, এই ভোরবেলা গলি ফেরিঅলাদের, যেন আমাদের

-কী চাই কী চাই?

কোথাকার কোন জীবনপোড়ানা সুরে, মহিলা বিকোচ্ছে—

ছাই নিবেননি ছাই....ই...'[২৯] (ভৈরবী)

(২) 'কিনেছি স্বপ্নের প্রেস

তাতে স্বপ্ন মুদ্রণ

করি

আসুন বসুন ভাই

স্বপ্ন কম্পোজ করুন

এবং ছাপুন আর বেচুন

কিংবা পান করুন'[৩০] (মুদ্রণ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন)

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠিত হলেও বাংলাদেশ যে একেবারে বিশৃঙ্খলামুক্ত হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করার ঘটনায়। একুশ বাংলাদেশের জনগণের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। সে-দিনের ভাষা আন্দোলনের সাফল্যে যে আত্মবিশ্বাস মানুষের মনে তৈরি হয়েছিল তার জন্যই স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। সেই সূত্রে একুশের কাছে বাংলাদেশের জনগণ চিরঋণী। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক মানুষ এই ঋণ ভুলে গেছেন। তাই ১৯৭১ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একাধিকবার একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালনকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। নয়ের দশকের শেষ পর্যায়ে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিরোধী নেত্রী তথা বি.এন.পি. চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর সহযোগীরা মিনার চত্বরে উপস্থিত হলে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিছু অপরিচিত দুষ্কৃতি জগন্নাথ হল-সহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় পুষ্পমাল্য থেকে ফুল ছিঁড়ে ফেলে, ফুলের মালা চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছুঁড়তে শুরু করে। এভাবেই শহিদদের পবিত্র বেদী নৈরাজ্যবাদীদের দ্বারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। এই লাঞ্ছনার কথা উঠে এসেছে আবিদ আনোয়ার-এর কবিতায়—

'মানতের মতো রেখে যায় কারা যার যার প্রিয় ফুল,
পাপড়ির মতো মাধুরী মেশানো নানা বর্ণের তোড়া:
শহীদ মিনার নিমেষেই দেখে ফাঁকা তার বেদীমূল
একুশের ফুল খেয়ে চলে যায় বাইশের লাল ঘোড়া!'[৩১] (বাইশের লাল ঘোড়া)

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে দেশের অভ্যন্তরে মৌলবাদীরা প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার পরিণামেই বাঙালির একুশ-কেন্দ্রিক শহিদ মিনার কালিমালিপ্ত হয়েছে। মৌলবাদীরা কেবল একুশে ফেব্রুয়ারি পালনেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি তারা দেশের বুদ্ধিজীবীদেরকেও আক্রমণের নিশানায় রেখেছিল। কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার চেষ্টা তেমনই একটি ঘটনা। তবে বুদ্ধিজীবীদের ওপর সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের আক্রমণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, গোবিন্দচন্দ্র দেব, সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, কবি মেহেরুন্নেসার মতো বুদ্ধিজীবীরাও ঘাতক বাহিনীর শিকার হয়েছিলেন। এটা ছিল পূর্ব-পাকিস্তানকে মেধাশূন্য করার চক্রান্ত। নয়ের দশকের শেষপ্রান্তে এসে কবি শামসুর রাহমান বাংলাদেশের মাটিতে মৌলবাদীদের অশুভ পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। সেই আশঙ্কা ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়—

'চাঁদের আংশিক ক্ষয় আর নক্ষত্রের
ত্রস্তরূপ দেখে বুড়ো শিরিষের ডালে
রাতজাগা প্যাঁচা বলে-'কবি আর
বুদ্ধিজীবী হননের কাল ফের শুরু হলো
বুঝি! জেনেছি, সদর স্ট্রিটে ক'জন
সন্ত্রাসী ক্রোধে জ্বলে একজন দীপ্ত
বুদ্ধিজীবীকে শাসায় সতেজ জীবনকে
প্রাণহীন ধূলায় লুটিয়ে দেবে বলে ক্ষিপ্র'[৩২] (অশনি সঙ্কেত)

কবির এই আশঙ্কা যে সত্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি। ঐদিন তিনি নিজ গৃহে আক্রান্ত হন। ঢাকাতে বসবাস করলেও তিনি নাগরিক কবির পরিচয়ে আটকে থাকেননি, হয়ে উঠেছিলেন জনগণের কবি। যখনই দেশের মধ্যে অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই কবি কলম ধরেছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কবি। মৌলবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বলেই নিজের বাড়িতে তাঁকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে কবির এই লাঞ্ছনায় নীরব থাকেনি বাংলাদেশের কবিসমাজ। এই ঘটনা উঠে এসেছে কবিতায়। কবিরা তীব্রভাবেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই ধিক্কারজনক ঘটনার—

(১) ‘সেদিন বিকেল বেলা বিশ্ব কবিতার ঘর নড়ে ওঠে
আচমকা আক্রান্ত হয় কবিশ্রেষ্ঠ শামসুর রাহমান
কবিতার মুক্তকণ্ঠ বাঙালির জাগ্রত বিবেক,
কুড়ালের ঘা'য়ে ছিন্নভিন্ন হয় সদ্য-লেখা পাণ্ডুলিপি।
প্রতিবাদী শব্দরাজি আচম্বিতে সামনে দাঁড়ায়
কবিতার বই থেকে উঠে এসে দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনও করে
দৃঢ় প্রতিরোধ-অকল্যাণকামী সেই নরপশুদের।’[৩৩] (প্রতিবাদী শব্দের মিছিল)

(২) ‘চাঁদের খবর নেই জেনে ব্যস্ত মানুষেরা
একদা ঘুমোতে গেলো; আর তখুনি শহর
প্রকম্পিত করে চতুর্দিকে রটে গেল
খুন হয়ে গেছে, খুন হয়ে গেছে, কবিকে করেছে
খুন, কুঠারে-শাবলে রক্ত মাখামাখি হয়ে
শঙ্কিত কবিকে তার স্বজনেরা নিরাপদে
আগলে রেখেছে;’[৩৪] (ডেড-লাইন ঢাকা, মার্চ ’৯৬)

আগেই আলোচিত হয়েছে যে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল বি.এন.পি.। তারা জামায়াতে ইসলামীকে সঙ্গে নিয়েই সরকার গঠন করেছিল। দেশের শিক্ষিত-সমাজও গোলাম আযম ইস্যুতে সরকারের বিরোধিতা করেছিল। গোলাম আযমসহ যুদ্ধপরাধীদের শাস্তির দাবিতে তৈরি হয়েছিল 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি', 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি', 'গণ-আদালত'। শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ধারাবাহিক আন্দোলন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ এক সমাবেশে পুলিশ জাহানারা ইমামের ওপর হামলা চালায়। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ, গোলাম আযম ইস্যুতে জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করলেও দেশের সপ্তম নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট করে ঐক্যমতের সরকার গঠন করেছে। পরবর্তীকালে জামায়াতে ইসলামী, বি.এন.পি.র সঙ্গে জোট করে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করেছে। কেবল তাই নয় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, গোলাম আযমের সঙ্গে ইফতার পার্টিও করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণের তুলনায় নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এই দ্বিচারিতায় সবচেয়ে বেশি অপমান করা করা হয়েছে শহিদ জননী জাহানারা ইমামকেই—একথা মনে করেন কবি মারুফ রায়হান। তাই শহিদ জননীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে দেশের রাজনৈতিক নেত্রীদের ব্যঙ্গের সুরে কবি বলেছেন—

> 'শহীদ জননী, আজকাল আমরা বড্ডো ক্ষমাশীল হয়ে উঠেছি
> আমাদের ক্ষমা করবেন
> পঁচিশ বছরের পুরনো পাপ, গণগণে একাত্তর, ভাইয়ের লাশ, বোনের ইজ্জত
> —এইসব আমাদের কাছে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।
> শহীদ জননী, আপনার নেতৃত্বে আমরা যে লোকটার বিরুদ্ধে একদা
> গণআদালত বসিয়েছিলাম, আমরা লক্ষ মানুষ এক প্রাণ হয়ে
> যে লোকটার ফাঁসি দাবি করেছিলাম

তাকে আজ আমরা গণতন্ত্রের সহযাত্রী বলে মেনে নিয়েছি।'[৩৫] (শহীদ জননী, ক্ষমা করবেন)

নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন এমন একটি আন্দোলন যেখানে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী দুটি প্রজন্ম একসঙ্গে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে রাজপথে লড়াই করেছে। পুনরায় দেশে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত হরতাল, মিটিং-মিছিলের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটে চলেছে। এমন উত্তপ্ত সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি আসাদ মান্নান লক্ষ করেছেন যে, বাংলাদেশের জনজীবন রাষ্ট্রযন্ত্রে নিষ্পেষিত। মেধা আর প্রতিভা বাংলাদেশে মূল্যহীন। কিন্তু কবি আশাবাদী। তিনি মনে করেন সন্ত্রাস ক্ষণস্থায়ী। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থেকে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ নিজের পায়ে ঘুরে দাঁড়াবে। কারণ বাঙালির সংগ্রামের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। তারা জানে দেশ আর দেশপ্রেম কখনো মরে না। যুগে যুগে গণতন্ত্র বেঁচে থাকে আপন শক্তিকে ভর করে। সেই গণতন্ত্রের কথা কবি তুলে ধরেছেন কবিতায়—

'চারিদিকে শুধু ক্ষয়, শুধু ভাঙনের জয়ধ্বনি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়
মনীষার নগ্ন পরাজয়।
ক্ষয়রোগে সভ্যতার ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে : অঝরে ঝরিছে মৃত্যু।
...এত রক্তপাত বুকে!
তবু সে দাঁড়িয়ে আছে দেশে দেশে, আছে এই মগের মুল্লুকে।'[৩৬] (হে অন্ধ জলের রাজা)

নব্বইয়ের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের লড়াই দেখেনি, ভাষা-আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান তাদের কাছে রূপকথার গল্পের মতো। তারা জানে না অজস্র রাজনৈতিক সংগ্রাম রক্তস্মৃতি হয়ে পথের ধুলোয় মিশে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আর্থ-সামাজিক নৈরাজ্য থেকে মুক্তি ঘটেনি। এই স্বদেশ বাংলাদেশের জনগণ চাননি, সে-দেশের কবিরা তাই বাংলাদেশ থেকে দূরে নির্বাসন নিতে চেয়েছেন। কিন্তু যে-স্বদেশ তাঁদের মাতৃভূমি, কিছু ক্ষমতালোভীদের চক্রান্তে তাঁরাই বা দেশত্যাগ করবেন কেন। তাই তাঁরা

বদলে ফেলেন সিদ্ধান্ত। প্রবলভাবে বেঁচে থাকতে চান আপন মাতৃভূমিতে সম্মান আর আত্মমর্যাদার সঙ্গেই—

'সাদা কবুতর উড়ে গেছে সব দূরে
এখন আকাশে চিল শকুনেরা ওড়ে
আমি ডাক দেই, প্রার্থনা করি এসো
সাদা কবুতর, শীতের পাখিরা এসো

প্রবল ডানায় উড়াও আমাকে নির্ভয় নিজ দেশে।'[৩৭] (সন্ত্রাস)

একাত্তরের স্বাধীনতা-যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের মর্যাদা পুরোপুরি ফিরে পাননি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল এক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী গুরুদাসীকে কেন্দ্র করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকসেনারা গুরুদাসীর বাড়িতে হামলা চালায়। চোখের সামনে গুরুদাসীর দুই মেয়ে, ছেলে ও স্বামীকে হত্যা করার পর গুরুদাসী পাকসেনাসের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। মানসিক ভারসাম্য হারান গুরুদাসী। বুকের মধ্যে নিজের মুক্তিযোদ্ধা স্বামী ও সন্তানের স্মৃতিকে অবলম্বন করেই বাঁচা শুরু হয় তার। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের জনসমাবেশে সমাবেশে পাগল অপবাদ দিয়ে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় গুরুদাসীকে। যিনি মুক্তিযুদ্ধে নিজের পরিবারকে উৎসর্গ করেছেন, তিনিই উপেক্ষিত থাকেন মুক্তিযুদ্ধের জনসমাবেশে। তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই কবি ত্রিদিব দস্তিদার বলেছেন—

'পতাকাটি চোখের তারায় ধরেই কাঁদেন দাসী
মুক্তিযুদ্ধ-সম্মিলনে
প্রবেশপত্র,
নেই যে তার মাসি
--সে যে শুধুই গুরুদাসী।'[৩৮] (যুদ্ধে গুরুদাসী)

এভাবেই বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্রকে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। গণতন্ত্রের এই অপসারণে সমাজে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তি। তবে এই ঘটনা হঠাৎ করেই নয়ের দশকে শুরু হয়ে বিস্তার লাভ করেনি। এর শিকড় প্রোথিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়েই। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুরকমের মেরুকরণ ঘটেছিল। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলেও একাত্তরের পরাজিত শক্তি দেশের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এরা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ গঠন করে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী সময়ে এরা প্রথমে জিয়াউর রহমান এবং পরে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পক্ষ অবলম্বন করে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য বি.এন.পি., জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট মিলিতভাবে চারদলীয় জোট গঠন করে। যদিও বছরের শুরুতেই বি.এন.পি., জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর আঁতাত গড়ে উঠেছিল। ৬ জানুয়ারি ঢাকায় এই ত্রিশক্তি সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দারিদ্র দূরীকরণ, দুর্নীতি, নগরায়ণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মান অবনতি নিয়ে একাধিক কনভেনশন আয়োজিত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য জনসভায় জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদসহ পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৬ মার্চ উদীচী গোষ্ঠীর জাতীয় সম্মেলনের শেষ দিনে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে সাতজন শিল্পী নিহত হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশের মাটিতে মৌলবাদীদের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পুনরায় শতাব্দীর শেষলগ্নে এসে বিষিয়ে উঠতে শুরু করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে মৌলবাদীদের সঙ্গে নিয়েই সরকার গঠন করে বি.এন.পি.। পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যেন সব জেনেও অন্ধ। তাঁরা ষাট-সত্তর-আশির স্বৈরাচারকে দেখেছে। নব্বইয়ে এসে গণতন্ত্রের মুখোশ পরা বি.এন.পি., আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতারণার শিকার হয়েছেন। আজও তাঁদের কাছে বি.এন.পি., আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো নতুন

রাজনৈতিক বিকল্প নেই। তাঁদের এই অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক দর্শনকে ব্যঙ্গ করে কবি সরকার আমীন বলেছেন—

'আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ
আমাদের সার্কাস পার্টি মূলত চার দশক ধরে
ক্রমাগত একই খেলা দেখিয়ে চলেছে ক্লান্তিহীন
অথচ আমাদের প্রতিটি শো হাউসফুল'[৩৯] (দশক জয়ন্তীতে জনগণের প্রতি)

কেবল সরকার আমীন নয়, রহমান হেনরীও জনগণের এই নির্বুদ্ধিতায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কাছে স্বাধীন বাংলাদেশ যেন 'সার্কাসমুখরিত গ্রাম'। যে-গ্রামে রাজনৈতিক দল সার্কাসের পার্টির ভূমিকায় অবতীর্ণ। জনগণকে তারা একের পর এক চটকদারি প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনার কথা শোনাচ্ছে। জনগণও সেই সব বিশ্বাস করে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠছেন। সার্কাসে যেমন নিপুণ কৌশল অবলম্বন করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা হয়, রাজনৈতিক দলগুলি তেমনি বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে ধরে রাখতে একের পর এক নিপুণ চক্রান্ত করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। কবি জনগণের এই অবস্থার মুক্তি চান। তাই রাষ্ট্রনেতাদের কাছে তাঁর কাতর প্রার্থনা—

''ও সার্কাস,
আফিম সার্কাস, আমাকে নিষ্কৃতি দাও। দৃশ্যের পরিধি থেকে
পরিত্রাণ দাও। ক্লাউন হে, জনতাকে মুর্চ্ছামুগ্ধ করো!''[৪০] (সাকার্স মুখরিত গ্রাম)

দেশের এই সংকটের দিনে যাদের এগিয়ে এসে সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, জনতাকে স্বপ্নের ঘোর থেকে বাস্তবের রূঢ় জগতে ফিরিয়ে আনার কথা, সেই যুবসমাজ এই অসুস্থ সম্ভাবনাহীন পরিবেশে বিকৃতির শিকার হয়েছে। অবসাদগ্রস্ত সমাজকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাদেরই। কিন্তু সম্ভাবনাহীন সমাজে তারাই আজ হতাশায়, স্বপ্নভঙ্গে বিচ্ছিন্ন, একাকী। তারা চেয়েছিল সমাজকে নতুন প্রজন্মের যোগ্য বাসভূমি করে গড়ে তুলতে, কিন্তু স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রশক্তি মেনে নেয়নি যুবসমাজের এই উদ্যোগকে। তাদের ওপর সমাজবিরোধী

তক্‌মা লাগিয়ে দিয়েছে। তরুণ প্রজন্ম যতবারই ফিরে আসতে চেয়েছে সমাজের মূলস্রোতে, ততবারই রাষ্ট্রের আঘাত খেয়ে ফিরে গেছে। সে-কারণে যুবসমাজের চোখ দিয়েই কবি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করেছেন—

‘গোলামের দলগুলো সাজিয়েছে হরেক পশরা
হাজারো কিসিমে যেন সাজে তারা বেহায়া ছিনাল।
লেবাস পাল্টাতে গিয়ে বারবার পড়ে যায় ধরা
সব গোলামের মাঝে লুকিয়েছিলাম এত কাল।
তুমি তো জানো নি প্রিয়ে কেন গেছি মদের দোকানে,
সময়-সমাজ-রাষ্ট্র হয়তো বা কিছু কিছু জানে।’[৪১] (আমি সেই মাতাল যুবক ১)

কেবল সৌমিত্র দেব নয়, বাংলাদেশের অনেক কবির কবিতাতেই বাংলাদেশের এই অরাজক পরিস্থির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে—

(১) ‘বাংলাদেশ
লাশের উপত্যকা কেবল মানুষের জন্য
কোথাও একটু নিরুদ্বিগ্ন ভূমি নেই
কেবল নীতিহীন রাজনীতি মানুষ কামড়াবার, তাড়াবার
বাতাসে মৃত্যুর সংবাদ-’[৪২] (মৃত্যুর সংবাদ)

(২) ‘মাটিতে কেবলই রক্ত ঝরে কারণে অকারণে
অন্ধকারে বাড়ে গুপ্তঘাতকের বকশিস
উদয়াস্ত শোকসভা আর বিলাপে মৃত, নিশ্চল
অসম্ভবের রৌদ্রগন্ধী ভ্রূণ,
চেনা পৃথিবীর নিবোর্ধ কারাবাস থেকে
পালাতে পালাতে দ্বীপ থেকে দ্বীপে
স্বেচ্ছা-নির্বাসনের নিঝুম পাতালে

সাঁতরে গেছে ব্রাত্য দম্পতি।'[৪৩] (এসো আগুনে ও কোরাসে)

(৩) 'কোথায় পালাবে বলো? সবদিক ছদ্মবেশী ঝাঁক-ঝাঁক
তীরবেষ্টিত নিষাদের দল। বেদনার উপশম কোথাও নেই
কার্পেটে, শয্যায়, সোফায়, টেলিফোনে স্বপ্নের ভেতরে হেঁটে
যায় বিষপিঁপড়ের ঝাঁক, ক্রমাগত বেড়ে ওঠে
রক্ত আর ক্রন্দনের নদী। ঘূর্ণায়মান নাভির স্রোতে
পাক খায় অক্ষত রমণীর শিল্পিত গ্রীবা
অতঃপর একদিন নাদান শত্রুরা মিথ্যে উল্লাস আর
নেশার দাপটে নিজেরাই হয়ে ওঠে নিজেদের হন্তারক।'[৪৪] (হন্তারক)

(৪) 'জল নেই, বেলাভূমে বালিয়াড়ি, জল কই?
কন্যাকে ভালোবেসে বড় বেশি বিবাগী পিতা।
বাতি নিয়ে ফিরে যায় বৃদ্ধ বণিক,
ঘুণকাটা আলো তার স্নায়বিক কলা ও কোষে।'[৪৫] (বেলে দশকের চিত্র)

রাজনীতি আর সাহিত্য মানবেতিহাসে দীর্ঘকাল পরস্পরকে প্রভাবিত করে এসেছে। কারণ সাহিত্য মানুষের আবেগ ও মননের সংমিশ্রিত বহিঃপ্রকাশ। সেই আবেগ ও মনন সামাজিক—পরিমণ্ডল-লালিত। সামাজিক পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতায়নের শ্রেণিবিন্যাস। রাজনীতি তাই সমাজের এত অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ যে, প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলের এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে একটি দেশের প্রতিটি নাগরিক কমবেশি সংলগ্ন থাকতে বাধ্য হন। কবিরা সেই নাগরিক সমাজেরই সদস্য। সে-কারণে তাঁদের কবিতায় উঠে আসে সেই রাজনৈতিক অভিঘাতের চিহ্ন। বাংলাদেশের কবিতা তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

২. আর্থ-সামাজিক সংকট

রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি নয়ের দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিও দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। নয়ের দশকের পুরো সময়টা জুড়েই কখনো বি.এন.পি. কখনো আওয়ামী লীগ—ক্রমান্বয়ে শাসক ও বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছে। তাদের রাজনৈতিক কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথক রাজনৈতিক দল হলেও, দেশের শাসনক্ষমতা দখল ও উন্নয়নের প্রশ্নে উভয় দলের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত একই রকমের ছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি-কেন্দ্রিক হলেও নয়ের দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ সহজ হয়। আধুনিকতার ঢেউ বাংলাদেশেও এসে পৌঁছোয়। কৃষির পাশাপাশি শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে আন্তরিকভাবে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়নি বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কোনোটিই। তারা নিজেদের ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতেই ব্যস্ত থাকায় দেশের মধ্যে একটি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সুবিধাবাদী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থান করায় রাষ্ট্রের সকল সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে করতে এই শ্রেণিটি সমাজের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। দেশীয় শিল্পকারখানা থাকলেও বিশ্বায়নের প্রভাবে বিদেশি পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেগুলো তেমনভাবে বিকাশলাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিও সরকারি ঔদাসীন্যে চরম অবহেলিত হয়েছে। গ্রামে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি এবং হাইব্রিড পণ্যের প্রতিযোগিতায় গ্রামীণ কৃষক বিপর্যস্ত হয়েছেন। গ্রাম-শহরের সমন্বয় না হওয়ায় দুই প্রদেশের আর্থিক বৈষম্য প্রকট হয়েছে। গ্রামের পাশাপাশি শহরের মধ্যবিত্তরাও সামান্য সুযোগ লাভের আশায় আত্মসম্মান বিকিয়ে নাগরিক অবক্ষয়কে মেনে নিয়েছে। সবমিলিয়ে নয়ের দশকের সমগ্র বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলেই ছিল অপূর্ণতা, অস্থিরতার ছায়া। কবিরা এই সময় বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতিকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন তা এই উপ-অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

নয়ের দশকের অস্থির সময়ে বিচলিত কবি হাসানআল আবদুল্লাহ। চারিদিকেই তিনি লক্ষ করেছেন মৌন আঁধারের উপস্থিতি। দুঃসময় কবির চিন্তা-চেতনাকে জটাজালের মতো পাকিয়ে তুলেছে। বিপর্যস্ত শহরে সন্ত্রস্ত সময়ও যেন অতিক্রান্ত হতে চায় না। সমগ্র স্বদেশ আজ বিপন্ন। কবি অনুভব করেন 'ঘুণপোকা' যেন প্রতিনিয়ত ক্ষয় করে চলেছে তাঁর অস্থি-মজ্জা-মাংস। ক্লান্তির ভারে কবি অসাড়, অবসন্ন। যখনই তিনি সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন, তখনই একবিংশ শতাব্দীর হাহাকার যেন অসুন্দরের তর্জনী তুলে তাঁকে শাসায়, ফিরিয়ে আনতে চায় বাস্তবের জগতে। যেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত কূটচক্রান্তে লিপ্ত। এই বিপন্নতা কবিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করে তাঁর চিন্তা-চেতনা। অসহায়ভাবে পৃথিবীর দিকে চোখ রাখেন কবি—

'এক হাতে কবিতা আর অন্য হাতে
একবিংশকে ধারণ করে
আমি পৃথিবীর দিকে চোখ রাখি,...
কেউ কেউ কর্মঠ হলেও
বাচালের সংখ্যাই অধিক—লোভ
হিংসা, সুলভ খ্যাতির আস্ফালনে ভরা
ঝকঝকে পাতা থেকে
ক্ষণস্থায়ী ভেজাল সুবাস ছোটে।'[৪৬] (ডাকবাক্সে সম্ভাবনা)

কেবল হাসানআল আবদুল্লাহ নয়, বাংলাদেশের অনেক কবির কবিতাতেই এই দমবন্ধ পরিস্থিতির চিত্র ফুটে উঠেছে—

(১) 'আমরা কেমন করে বেঁচে আছি এ-শহরে
যে-শহর বেশ্যাবৃত্তি করছে দিনে ও রাতে
সারাক্ষণ;...যার প্রাত্যহিক
ভীড়ে নিজের শহরে নিজেকেই বহির্বাসী
মনে হয়; বলো কী করে বাঁচবো এ শহরে

যেখানে মানুষ বেশি করে ঘৃণ্য কুকুরের চেয়ে'[৪৭] (কেমন করে বেঁচে আছি এ-শহরে)

(২) 'এই শহরে কিছু একটা হবে
বড্ড খারাপ কিছু
কুকুর হাউমাউ করে কাঁদে সারারাত
পুলিশ ভ্যানের শব্দ হয় গলিতে
মাইক্রোবাস সন্ধ্যার মুখে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায় মানুষের লাশ
সবাই বলে খুব খারাপ সময় এখন
একটা কিছু হবে এই দেশে।'[৪৮] (এই শহরে একটা কিছু হবে)

(৩) 'বলেছি, তবুও সব বলা কি সম্ভব? 'জরুরী অবস্থা' জারী রয়েছে এখানে
খাকি ও বন্দুকে ভরা চতুর্দিক। জিহ্বা ও বিবেক বিক্রি দোকানে দোকানে
বাচালের ভাষ্য নিয়ে তত্ত্বের বাজার বেশ! মানুষের বিচিত্র স্বভাবগুলো দেখো
অস্ত্রের উৎসাহে আজ বন্দুকের নল হয়ে সপ্রভিত হিংসা চর্চা করে।'[৪৯]
(কাগজের নৌকা)

(৪) 'সম্রাটের শিরোভূষণের মতো গেছে সবকিছু—
ক্ষমতার পিছু-পিছু নেমে গেছে গোটা পারিষদ
ভাঁড় ও ভাণ্ডের দল, যথারীতি গেছে পুরোহিত
হাটভাঙা সন্ত্রাসের ভয়ে চলে গেছে হারেম-সুন্দরী
এখন শুধুই ক্ষয়, চারপাশে ক্ষয়ের পতাকা;'[৫০] (তৈমুরের ঘোড়া ও কৃপাণ)

(৫) 'এ কী বৈরী যুগে এসে দাঁড়ালাম আমরা সকলে

সূর্য নিয়ত ঢাকা চিররাহুগ্রাসে, মানবিক
প্রশান্ত বাতাস এখন বয় না কোনোখানে
শুধু সর্বত্র বেড়ায় নেচে কবন্ধ-দানব;
তাদের কদর্য চিৎকারে ফেটে যায় কান,
চোখ হয়ে যায় কী ভীষণ রক্তজবা সহসা
দিগন্ত জুড়ে নেমে আসে ঘোর সন্ধ্যার আঁধার।'[৫১] (যদুবংশ ধ্বংসের আগে)

চারিদিকে কেবলই ফাঁপা সহানুভূতি, যারা অন্ধ তারাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রখর দৃষ্টির অধিকারী। একদা জীবনানন্দ-কথিত অদ্ভুত এই আঁধারে যখন পরবর্তী প্রজন্মকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই, তখন কবি জ্বলন্ত সময়কে উপহার হিসাবে রেখে যেতে চান উত্তর-প্রজন্মের কাছে—

'রাজপথের মিছিল পদযাত্রার শোভা;
রিক্‌শা-গাড়ি ভাঙচুরের দৃশ্য হাতবোমা
কিংবা টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ার নকল কাঁদন
রাবার বুলেটের ছুটে যাওয়া
ধরা যেতো এই কালো হরফের বুকে-মন্দ হতো না;
এই তেজি সময়ের লিখিত দলিল
পর প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া যেতো সহজেই।'[৫২] (কালো হরফের খাতা)

বাংলাদেশের সর্বত্র সুষম বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টি ছিল রাজধানীর প্রতি। গ্রামীণ জীবনযাত্রার বিকাশে তারা মনোনিবেশ করতে পারেনি। সে-কারণে স্বাধীনতার কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বাংলাদেশের গ্রাম-শহরের সুষম সমন্বয় ঘটেনি। গ্রামীণ সমাজ অন্ধকারেই থেকে গেছে। নিজেদের স্বাধীনতা, প্রাপ্য দাবি আদায়ের জন্য মানুষ অনেক লড়াই করেছেন। কিন্তু সে-দিনের লড়াইয়ে যারা তাঁদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ক্ষমতার মোহে আজ তারা সেই জনগণকে ভুলে গেছে। ক্ষমতার মোহ তাদের স্মৃতি থেকে অভুক্ত গ্রামীণ

কৃষকের চিত্র বিলীন করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কৃষকের সমস্যা মেটেনি। আজও বাংলাদেশের কৃষক অন্নের অভাবে দু'বেলা খেতে পান না, সারের অভাবে জমিতে উন্নত ফসল ফলাতে পারেন না। সামাজিক দুযোর্গে অন্ধকার নেমে আসে কৃষকের ঘরে। গ্রামীণ অর্থনীতির এই অবহেলিত চিত্র উঠে এসেছে হাসানআল আবদুল্লাহর কবিতায়—

> 'আরশের দিক থেকে চোখ তুলে কৃষক আবারো কয়,
> কর্তা কিছু দাও।
> আকাশ কাঁপানো শব্দ ওঠে: ব।
> কৃষক লাঙল নিয়ে মাঠে যায়।
> কর্তা কন, বুঝলা জোয়ান!
> হ হ হ ...
> আপনি কইছেন বাংলাদেশ।
> বঙ্গীয় ব-দ্বীপ থেকে আওয়াজ ওঠে: ব ব ব।
> বায়ান্ন, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ।'[৫৩] (বঙ্গীয় উপনিষদ)

কবিতাটিতে রাষ্ট্রের প্রতারণায় কৃষি-অর্থনীতির অবনমনের ছবি প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের রক্তঝরা ভাষা-আন্দোলন বাঙালিকে সাফল্যের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই স্বপ্নকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের মানুষ একের পর এক আন্দোলনে ঝাঁপিয়েছেন। ছিনিয়ে নিয়েছেন নতুন দেশ। তাঁরা স্বাধীনতা পেয়েছে, বঙ্গবন্ধুর মতো দেশের নেতাকে পেয়েছেন, কিন্তু তারপরেও বঞ্চিত হয়েছেন নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে। সমগ্র আটের দশকে বাংলাদেশ সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটেছে। সংসদীয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু জনগণের দাবি-দাওয়া অপূর্ণই থেকে গেছে। গ্রামীণ মানুষের সেই দুর্দশা রূপকার্থে উঠে এসেছে আহমেদ স্বপন মাহমুদ-এর কবিতায়—

> 'আমিও মাঠের কৃষক, ভাষা দিয়ে করি চাষাবাদ
> কখনো কলার ভেলা কখনো ছইয়ের নাওয়ে হাওরের বুকে তুলেছি গান,

আর শব্দে শব্দে যত বাদ্য হয়, যত হয় সফল কীর্তি, সব ভুলেছি মর্মে—
তথাপি কিছু ভুল হয়ে গেছে, কিছু রয়ে গেছে ধারাপাতে—
তোমরা কি জানো, কেন বৃষ্টি হয় শরৎ ও হেমন্তে—কেন বেজে ওঠে
চোখ, কেঁদে যায় বাঁশি?'[৫৪] (নায়ক ৩)

কৃষকের কৃষি-প্রকৌশলের সঙ্গে নিজের কাব্য-কৌশলকে মিলিয়ে নিয়ে কৃষকের দুঃখে বিলীন হতে চেয়েছেন কবি। রাষ্ট্রের প্রতারণায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত গ্রামীণ কৃষক। কালের বিবর্তনে আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ে গ্রামীণ অর্থনীতি। এগিয়ে যায় শহরের অর্থনীতি। সে-জন্য নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বিকল্প জীবিকা খুঁজে নিতে বাধ্য হন গ্রামীণ মানুষ। কৃষকও লাঙল ত্যাগ করে সামান্য মজুরির আশায় শহরের পথে পা বাড়ান। সাধারণ মানুষের এই সংকটের কথা উঠে এসেছে কবিতায়—

'কাদা নয়,
হাঁটুতে রাজ্যের ধুলো নিয়ে
ঘরে ফেরে
শুধু চাষী নয় রাখাল, শ্রমিক-
আর নগরীর টুকিটাকি মানুষেরা।'[৫৫] (কাদা নয়, হাঁটুতে রাজ্যের ধুলো)

এখানে গ্রামীণ মানুষদের কয়েকটি শ্রেণিস্তরকে তুলে ধরেছেন কবি চাষি, রাখাল, শ্রমিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে। যাঁরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে রাখেন, তাঁরা থেকে যান প্রদীপের তলার অন্ধকারে। তাঁদের বানানো অট্টালিকাতেই ধনীরা বিলাস-বৈভবে মেতে ওঠে, কিন্তু আশ্রয়হীন থেকে যান এই শ্রমিকরা। সামাজিক বৈষম্যের ফলে শ্রমিকের দল অনাহারে থাকে আর একশ্রেণির বিত্তবান মানুষ এদের পাশে না দাঁড়িয়ে খামখেয়ালিপনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যাদের সস্তা শ্রমে ধনীরা গড়ে তোলে অর্থের পাহাড়, তাদেরকেই সুযোগ পেলেই মাটিতে পিষে ফেলতে চায় বিত্তবান সমাজ। অথচ সবাইতো মানুষ, ঈশ্বরের সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠজীব। তবুও এই বৈষম্যের জন্য মেহনতি মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কবি—

'আমাদের পরিচয় তোমাদের কাছে মানুষ নয়, শ্রমিক।
আকুতি রহিল আজ বিনাশ করিওনা আমাদের জাত
মনুষ্যের নামে সৃষ্টি একি করেছো ঈশ্বর?'[৫৬] (মোরা মেহনতি মানুষ)

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত যে প্রতিবেদন পেশ করে সেখানে দেখা যায় বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই রাষ্ট্রের মৌলিক জনসেবা থেকে বঞ্চিত। দেশের জনসংখ্যার মাত্র পনেরো শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ পরিসেবা পায়, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার হার মাত্র চল্লিশ শতাংশ। হাজারে দু জন মানুষ টেলিফোন ব্যবহার করে। অথচ বাংলাদেশে লক্ষাধিক টাকা ঘুষ দিতে পারলে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল, টেলিফোনের সংযোগ পাওয়া সম্ভব। অথচ সরকার নির্ধারিত অর্থে কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সংযোগ পেতে সময় লাগবে সর্বনিম্ন তিন মাস থেকে বারো বছর।[৫৭] সরকারি প্রশ্রয়ে এক শ্রেণির অসৎ চক্র বাংলাদেশে এই অরাজকতা তৈরি করেছে। তারা হয়তো বাংলাদেশেরই আগামী প্রজন্ম, অনেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান। বেকারত্ব ও দারিদ্র্য থেকেই তারা সমাজের চোরা গলিতে আজ প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থার কথা উঠে এসেছে রফিক আজাদের কবিতায়—

'সফল বণিক, স্যর, রাজাকার পিতার সন্তান—
নিশ্চিন্তে থাকুন ধরে নেত্রকোণে শুধু
অশ্রুর সামান্য অংশ, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান
নয়া ব্যবসায়ী, সবকিছু, স্যর দ্রুত
সুনিপুণভাবে সুসম্পন্ন করে দেবো।'[৫৮] (নয়া উদ্যোগ)

একাত্তরের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ লাভ করতে শুরু করে আটের দশক থেকে। নয়ের দশকে কৃষির পাশাপাশি শিল্পও অর্থনীতির গতিবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে থাকে। তালমিলিয়ে বৃদ্ধি পায় ব্যাংকের সংখ্যা। কিন্তু সংখ্যায় বাড়লেও দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্র সংকটে পড়ে। এই সংকটের অন্যতম কারণ ছিল খেলাপি ঋণ। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের পর

থেকে ব্যাংকের দেওয়া ঋণের চল্লিশ শতাংশই 'মন্দ ঋণ' (যে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা ক্ষীণ)। আর এই সমস্ত ঋণ দেওয়া হয়েছিল ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর অর্থ থেকে। এই সমস্ত ঋণ উদ্ধার না হলে সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্পদে সকলের সমান অধিকার। দরিদ্ররা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে তার যথার্থ ব্যবহার ও পরিশোধ করে সময় মতো। কিন্তু বাংলাদেশে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে মুষ্টিমেয় কিছু ধনী মানুষ। যারা ঋণ ফেরত দিতে অনীহা দেখায়। বাড়তে থাকে ঋণের বোঝা। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ জাতীয় সংসদে প্রায় দু হাজার ধনী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়, যারা ঋণ খেলাপির দায়ে অভিযুক্ত। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রী মাওলানা এম এ মান্নান-এর চারটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল তেরো কোটির টাকার অধিক। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর বাংলাদেশের মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় তেইশ হাজার সাতশো এগারো কোটি টাকা।[৫৯] এই বৃহৎ ঋণের বোঝা থাকায় স্বাভাবিক কারণে ভেঙে পড়ে দেশের অর্থনীতি। যার ফল ভোগ করে দেশের সাধারণ মানুষ। তাঁরা ধুঁকে ধুঁকে বাঁচতে থাকেন। ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করে বিত্তশালী মানুষ। আর অনাহারে ক্ষয়িষ্ণু শরীর নিয়ে রাস্তায় ঘোরে সর্বহারা শ্রেণি। যারা ঋণ গ্রহণ করে তারা কেবল ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের মাটি ও মানুষের কাছেও সমানভাবে ঋণী। কারণ দেশ ও মানুষ ব্যতিরেকে বাদবাকি সবই অস্তিত্বহীন। তাই কবিরা দেশের মানুষকে বাঁচাতে ঋণদাতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে ঋণশোধ করার জন্য। তাঁদের আবেদন ফুটে উঠেছে কবিতার মধ্যে দিয়ে—

(১) 'টাকাগুলো দিয়ে দিন
কাঁকড়ার দাঁড়া হয়ে এই ঋণ ধরছে চেপে
এদেশের মানুষের গলা—
তাদের দেখিয়ে কলা উৎসবের আলো নিভে গেছে,
খড়খড়ে অন্ধকার প্যারাট্রুপারের মতো সংগোপনে
ঝাঁপিয়ে নামছে দ্রুত এই বাংলাদেশ;'[৬০] (ঋণখেলাপিদের প্রতি)

(২) ‘আমিও খেলাপি এক, প্রকৃতই ঋণের খেলাপি;
কোনো অর্থপ্রতিষ্ঠানের নয়—খেলাপী করেছি ঋণ
মাটি ও মায়ের কাছে, ছোট্ট প্রজাপতিটি কাছে,
আমার রয়েছে ঋণ বহু নারী ও শিশুর কাছে,’[৬১] (ঋণখেলাপির মনস্তাপ)

(৩) ‘দলবদলের পালা ছাড়া তেমন বিশ্বস্ত রাজনীতি নেই
মানুষের সমূহ কল্যাণে,
অন্ধকারে বাড়ে কেবল ঋণের সুতো
শুধু নতুন মোড়কে চকচক করে ওঠে খ্যাতির আসন।’[৬২] (পালাবদল)

(৪) ‘আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দেবো—ঋণগ্রস্ততা আর
ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকবার; নিয়ে যাবো শস্যান্তরে;
শস্যাবর্তের প্ররোচনায়--’[৬৩] (কৃষিকথা)

আর্থিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও বাংলাদেশের জনগণের জীবনে নিত্যই সংকট সৃষ্টি করেছে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে অনাবৃষ্টির কারণে ভয়াবহ খরা দেখা দেয়। এর ফলে বাংলাদেশের প্রধান কৃষিফসল ধান এবং পাট উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খরার প্রকোপে চাল উৎপাদন কমে যায়। চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ায় মানুষ অনাহারে মরতে শুরু করেছিল। এই সময় দু’বেলা দু’মুঠো ভাতের অভাবে মানুষের যে হাহাকার তা উঠে এসেছে রফিক আজাদের কবিতায়—

‘যুদ্ধে ও মন্বন্তরে জন্মে নিরন্তর খাদ্যাভাবে
বেড়ে উঠি পালা ও পার্বণহীন;
বিপন্ন শৈশবে আর বিব্রত কৌশোরে

চতুর্দিকে শুনি হাহাকার, আর্তনাদ, আহাজারি;
অন্নবস্ত্রহীন মানুষের ভিড়ে ভিতরে বেড়ে
চতুর্দিকে দেখি পোড়োজমি, শস্যরিক্ত মাঠ আর
ন্যুব্জপীঠ কৃষকের শূন্যদৃষ্টি, বিধুর ভুবন!'[৬৪] (পরিচয়)

আর্তের হাহাকার কবিকে পীড়িত করলেও সব মানুষকে বিচলিত করে না। সমাজের এক শ্রেণির আত্মমগ্ন মানুষ সবসময় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে ভোগবাদী জীবনে। সামাজিক যে অবস্থানে তার বাস, সেখানে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের কোনো মূল্য নেই। তাই দুর্ভিক্ষের কান্নাকে ছাপিয়ে তার কাছে বড়ো হয়ে ওঠে আর্ত-ধ্বনি। মানুষের এই স্বার্থপরতা ভুলতে পারেন না কবি আবিদ আনোয়ার। তাঁর কবিতায় উঠে আসে সামাজিক এই বৈষম্যের চিত্র—

'শীৎকারের চেয়ে দামী সেই বাজনা ভুলে যাই
আড়ষ্টের মতো কোনো কোনো দিনের ব্যর্থতা,
পীড়িত শিশুর কান্না, আর গণবিক্ষোভের নামে
রাজ্যিশুদ্ধ হা-ভাতের হাউকাউ।'[৬৫] (অতিশব্দের নীলশিখা)

খরার মতো যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সংকট সৃষ্টি করেছিল সেটি হল বন্যা। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ একাধিকবার ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯74, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের পর শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে অগাস্ট মাসে ভয়াবহ বন্যার সামনে পড়েছিল বাংলাদেশের মানুষ। বাংলাদেশের প্রায় আটষট্টি শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। এই বন্যায় মানুষ এবং গবাদি সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি এবং লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি বিপর্যস্ত হয়। গৃহহীন হয়ে পড়ে লক্ষাধিক মানুষ। সঙ্গে দেখা দেয় ভাতের জন্য হাহাকার। স্বজনহারা মানুষের এই দুর্ভোগচিত্র উঠে এসেছে কামাল চৌধুরীর কবিতায়—

'হৃদয় দুর্দশাগ্রস্ত। এখন যেখানে থাকি তার নাম স্থলভাগ নয়
চতুর্দিকে বেনোজল, থৈ থৈ নদী-নালা সমুদ্রের ঘৃণা

বাঁধ ভাঙছে, গ্রাম ডুবছে, শহরেও লুপ্ত সড়ক
বাংলাদেশ আজ আদিগন্ত বন্যাপথ, নৌকাপথ
ত্রাণশিবিরের দিকে সাঁতরে যাচ্ছে মেয়ে শিশু, ছেলে শিশু
কন্যা বধু মাতা
এখন ভাতের স্বপ্নে চতুর্দিকে সাঁতার কাটছে ক্ষুধার্ত থালা
ধাবমান ত্রাণশিবির আজ বাংলাদেশ।'[৬৬] (বন্যা ১৯৯৮)

অনেক ক্ষেত্রে কবিরা সামাজিক অবক্ষয়কে স্পষ্ট ভাষায় সরাসরি আক্রমণ না করে রূপকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চান। রফিক আজাদ তেমনই বাংলাদেশকে শস্যক্ষেতের সঙ্গে তুলনা করে দেশের শত্রুদেরকে পরোক্ষে আক্রমণ করেছেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-পাকিস্তানকে রক্তরঞ্জিত করে যে বাংলাদেশ গঠিত হয়েছিল, তা ছিল সম্ভাবনাময় শ্যসভূমির মতো উর্বর। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিচক্ষণতার অভাবে অচিরেই এই স্বর্ণভূমি মৌলবাদী, রাজাকারদের মতো ক্ষতিকর আগাছাতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যেকোনো আগাছাই যেমন ফসলের ক্ষতি করে, তেমনি এই সমস্ত রাজাকার, মৌলবাদীরা শুরু থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলতে চেয়েছে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। তাদের এই চক্রান্তের কারণে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে নিহত হতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে সেনাবাহিনীর হাতে। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা আগাছার মতোই বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রায় দেড় দশক এই অরাজকতা চলার পর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর তারা রাজাকারদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে। এরপর পুরো নয়ের দশক জুড়ে কখনো বি.এন.পি., কখনো আওয়ামী লীগ-এর সঙ্গে রাজনৈতিক জোট তৈরি করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে জামায়াতে ইসলামীর মতো রাজনৈতিক দল। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। গণতান্ত্রিক দেশে জামায়াতে ইসলামীর এই উত্থান দেখে ক্রুদ্ধ কবি বলে ওঠেন—

'আবারও ঘটছে দেখি আগাছার সমূহ বিস্তার,
নতুন ও পুরাতন আগাছারা মিলে বেড়ে উঠছে
ব্যাপক, বিস্তৃতভাবে এ-গাঁয়ের পথে ও প্রান্তরে,
সোনালি শস্যের এই মাঠে শস্যের বিরুদ্ধে বাড়ে
গোপনে-প্রকাশ্যে খুব ক্ষতিকর বিবিধ আগাছা!
আগাছার জন্যে, কেন যেন মনে হয়, অনুকূল
আবহাওয়া তৈরি হয়ে ছিলো দীর্ঘ দুইটি দশক;
এখনও আবাদ হবে— শস্য নয়— বংশ আগাছার?।'[৬৭] (আগাছা কাহিনী)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সমাজে বসবাস করতে করতে সে নাগরিক অবক্ষয়ের শিকার হয়, বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্রমাগত খাঁচার মধ্যে বদ্ধ থাকার কারণে পাখির স্বপ্নিল পাখা যেমন ওড়ার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলে, তেমনি সমাজের খাঁচায় বদ্ধ মুক্তিকামী কোনো কোনো মানুষ মুক্তির প্রত্যাশায় ক্রমাগত ছটফট করতে করতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে অসামাজিক জীবে পরিণত হয়, পা বাড়ায় সমাজের অন্ধকারে। এই সমস্ত মানুষ তখন সভ্য সমাজের কাছেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই বিপজ্জনক মানুষের কথা উঠে এসেছে একাধিক কবিতায়—

(১) 'মানুষের দাঁত নখ লোভের শানানো ছুরি
এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র
ব্যবহৃত প্রকৃতি ও পাখির বিরুদ্ধে
মানুষের হাতে
মানুষেরই জীবন কি নিশ্চিত ও নিরাপদ?'[৬৮] (মানুষ বড়ো বিপজ্জনক)

(২) 'মানুষের কাছে আমি ঠকেছি বারবার; তবু গেছি
মানুষের কাছে গেলে বারবারই ঠকে ফিরতে হয়

মানুষও প্রকৃতি তবে সে এখন সভ্যতার ঘুণ—
ধর্ম রাষ্ট্র আর পরিবারে বাঁধা এক স্বার্থপর জীব'[৬৯] (আঁতুড়কথন)

(৩) 'মানুষ আসছে মানুষ আসছে পালাও,
কোনদিকে যাবো কোনদিকে যাবো বলো?
উত্তর নেই উত্তর নেই পালাও পালাও পালাও,
মাছগুলি ধায় জলের অতলে মৃত্যুভয়ে কাঁপে।'[৭০] (মানুষ আসছে, পালাও)

মানুষের এই আত্মক্ষয় মানবতারই অপমান। এর জন্য দায়ী সমাজের অপদার্থ শাসক। দেশের শাসনক্ষমতা হাতে নিলেও তারা সামাজিক বিকাশে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাছেই দেশের অর্থনীতিকে বিকিয়ে দিয়েছে। সমাজ ক্রমশই এগিয়ে গেছে অন্ধকারের দিকে। লোভের কাছে তারা বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদের, হয়ে উঠেছে মেরুদণ্ডহীন নির্জীব সামাজিক জীব। মনুষ্যত্বের এই অবমূল্যায়নকে পশুর রূপকে তুলে ধরেছেন কবিরা—

(১) 'চিড়িয়াখানার সিংহের খাঁচার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম
শুকিয়ে যাওয়া কালচে রক্তের দাগভরা
একটা মাংস ও হাড়ের টুকরো নিয়ে সিংহটি খুবই ব্যস্ত ছিল তখন;
আমাকে দেখেই দুই থাবা তুলে সালাম দিয়ে গো গো শব্দে বলে ওঠে—
'ইয়েস স্যার।'
আমি খুবই দুঃখ পেলাম।
দুর্দান্ত কেশর-অলা সিংহের কাছ থেকে
চাকরিজীবীদের মতো এমন মেরুদণ্ডহীন আচরণ
আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারলাম না।'[৭১] (ইয়েস স্যার)

(২) 'অক্ষম প্রজাতি এরা, প্রতিবাদে কাঁপে না শরীর

কেবল নিয়তি নিয়ে বেঁচে আছে আঁধার পল্লীতে
যেখানে ছড়ায় জ্যোৎস্না পূর্ণিমার চাঁদ
আর দেয় বলি দেবতাকে টোটেম বিশ্বাসে
রাঙায় খোলস, প্রাককককপুরুষের।'[৭২] (শোষণ)

(৩) 'ভূমিকম্পপ্রবণ এই চণ্ডালের দেশে
এইভাবে একদিন
ঘুম ভেঙে দেখবেন
পতাকা ও মানচিত্রবদলে গেছে...
দোহাই আপনাদের দয়া করে
তখনও আপনারা নিশ্চুপ থাকবেন।'[৭৩] (প্রেসনোট থেকে বাদ পড়ে যাওয়া কিছু অংশ)

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে ঢাকায় আওয়ামী লীগ এক অধিবেশনে একুশ শতাব্দীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সময়োপযোগী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। যে দেশ হবে ক্ষুধা, দ্রারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। বাঙালি জাতি জন্মলাভ করবে নতুনভাবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের এই ঘোষণা বাস্তবে ফলপ্রসূ হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। নয়ের দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনকল্যাণের তুলনার রাষ্ট্রক্ষমতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় জনগণের দাবি অবহেলিত হয়েছে। এর ফলে দেশে অচিরেই দারিদ্র্য, অশিক্ষার মতো ব্যাধি দেখা দিয়েছে। এই দেশ কবিদের চোখে মাতৃভূমি নয়, 'বাস্তুঘুঘুর বিচরণভূমি' হয়ে ধরা পড়েছে। যেখানে মানুষ স্বপ্নহীন, বিকৃতচিত্তের অধিকারী। যেখানে পুরুষেরা সারাদিন নারীর কথা ভাবে, বৃদ্ধেরা অপেক্ষা করে মৃত্যুর, যুবকরা মাতে অস্ত্রসজ্জায়, তরুণীরা প্রযুক্তিতে বিভোর। নষ্ট জীবনের হাতছানিতে দেশের মানুষ যেন চোরাবালির দিকে ধেয়ে চলেছে, কোনো ঘোড়সওয়ার

আসবে না জেনেও। সমগ্র সমাজকে পরিকল্পিতভাবে অন্ধকারের দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষ—

(১) 'বাস্তুঘুঘুর সময় এসেছে
তুলনাহীনের দেশে
এখানে এখন
প্যাণ্ডেলে ঘেরা ম্যাজিকের দল
ভেল্‌কিবাজির শ্রমণেরা দেখি
গৈরিকপরা জ্ঞানের বুদ্ধ
সংঘ নিয়েছে মস্তানকুল
ধর্মে শরণ বকরাক্ষসে—'[৭৪] (ঘোড়সওয়ার)

(২) 'এখানে রিরংসার শিকার হয় অবোধ শিশুরা
এখানে অনাদরে শুয়ে থাকে সতেজ ভ্রূণের লাশ
এখানে দেহ বাঁচাতে মানুষ দেহ বিক্রি করে অষ্টপ্রহর
এখানে শ্বাস নেবার জন্যে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের বড় অভাব।'[৭৫] (এখানে মানুষ)

(৩) 'এ গাঁও বিক্ষত বিষণ্ন ত্রস্ত একা
সংকটে বাঁচে
মানুষের সম্প্রীতি মানবাধিকার
স্বপ্ন চিন্তা প্রেম
হেরে গেছে স্বদেশের কতিপয় মানুষের কাছে'[৭৬] (অপরাহ্নে শীতার্ত ভীমপুর)

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে হরতাল বা ধর্মঘট গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল নয়ের দশকে। প্রথম হরতাল পালিত হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯

খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র দেশে অজস্রবার হরতাল পালিত হয়। বি.এন.পি. শাসনক্ষমতায় থাকাকালীন হরতালের বিরোধিতা করলেও ক্ষমতা হারানোর পর তারাও দেশে হরতাল ডাকা শুরু করে। এই হরতাল চূড়ান্ত আকার ধারণ করে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে। এই বছর প্রতিমাসের কোনো না কোনো দিনে হরতাল চলেছিল। এই হরতাল দেশের অর্থনীতির যে পরিমাণ ক্ষতি করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১০ ডিসেম্বর। ঐদিন দেশের এগারোটি ব্যাবসায়ী সংগঠন শেখ হাসিনার হরতাল বন্ধের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এত কম সময়ে এতবেশি ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল যে, হরতাল যেন বাংলাদেশের মানুষের নিত্যদিনের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হরতালের ফলে সবচাইতে বেশি ক্ষতি হয়েছিল সাধারণ মানুষেরই। সে-কথা তুলে ধরেছেন কবি—

‘কলের চাকা দু’দিন গেলে বন্ধ হয়
দেশ তো স্বাধীন, স্বাধীনতা মন্দ নয়।
রাজপ্রাসাদে যে যায় সে-ই স্বৈরাচার,
এই তো সুযোগ নিজের আখের কইরা ছাড়!’[৭৭] (সময়ের ছড়া)

কিন্তু এই বাংলাদেশ তো জনগণ চাননি। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবিকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ায় কথা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে যেতে সময় লাগেনি বাংলাদেশের জনগণের। বিশ শতকের শেষ দশকে বাংলাদেশের মাটিতে দুঃশাসনদের দাপাদাপি। মানুষের স্বপ্নের পথ জুড়ে পড়ে থাকে মৃত্য শিশুদের হাড় আর বিধবা নারীর সিঁদুর। নগরের আলো উজ্জ্বলতা হারিয়ে বিবর্ণ। যে আলোয় দেখা যায় ‘চামড়া ছাড়ানো ঝুলন্ত পশুর দেহ’ আর ‘কসাইয়ের অপেক্ষারত মুখ’। সমগ্র সন্ধ্যা যেন কীটের মতো পচনের অপেক্ষা করে যাচ্ছে। কবি এখানে ভোগবাদী নষ্ট সমাজের চিত্রই অঙ্কন করতে চেয়েছেন, যেখানে বাংলাদেশ ধরা দিয়েছে বধ্যভূমিরূপে—

‘দেখে যাও কঙ্কাবতী তোমার সোনার
বাংলাদেশে হাড়ের বিশাল খনি পাওয়া গেছে:
নারী পুরুষের খুলি, জঙ্ঘা ও চোয়াল

ন'হাত মাটির নীচে, জলের তোড়ের নীচে
স্তবকে স্তবকে রাখা মানুষের অস্থিসমুদয়
ওগো কঙ্কাবতী।'[৭৮] (বধ্যভূমি থেকে)

নয়ের দশকের ব্যতিক্রমী কবি বিপ্লব ফারুক। এই দশকের কবিরা যেখানে রাজনীতিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন, আশ্রয় করেছেন মিথ-পুরাণকে, বর্তমানের স্বপ্নহীন সমাজে নিজেদের অতীততের গৌরবময় স্মৃতিকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছেন, সেখানে বিপ্লব ফারুক স্বতন্ত্র। বাংলাদেশকে ঘিরেই তাঁর কবিতার জগৎ নির্মিত এবং আবর্তিত। কবি দেখছেন সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবায় তাঁর মাতৃভূমি বিপদগ্রস্ত। কবির চোখের সামনে স্বর্গভূমি বাংলাদেশ ধীরে ধীরে নরকে পরিণত হচ্ছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সমগ্র দেশের মানুষ। দুর্নীতি, মারণব্যাধির মতো জনগণের জীবনে চেপে বসেছে। সন্ত্রাসের করাল থাবায় প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছে বাংলাদেশের মাটি। দেশেরই একশ্রেণির মানুষের হাতে সম্পদের সিংহভাগ সঞ্চিত হওয়ায় সমাজের চালকের আসনে বসেছে তারাই। অন্যকে আহার যোগানো যার কর্তব্য, সে নিজেই আজ অন্যের আহার ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত। সংগ্রামী বাংলাদেশে শাসকের এই ভেকধারণ মানতে পারেন না কবি। তাই যারা বাংলাদেশের মানুষের মস্তিষ্কে পচন ধরিয়েছে, দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করেছে, দেশকে কলুষিত করেছে, তাদের পরাজিত না করলে দেশের মানুষ স্বাধীন হবেন না বলেই মনে করেন তিনি। সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়ালেই দেশকে শত্রুমুক্ত করা যাবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। তাই রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে জাতির নিদ্রিত বিবেককে জাগাতে কবিতাকে হাতিয়ার করেছেন তিনি—

'কারোর সাজানো কষ্টের অধরে বাংলাদেশ
দু'বেলা দু'মুঠো গরম ভাতের স্বপ্ন দেখে
কালঘুমে আছে। আমি তার নাগরিক হয়ে
অধিকার চাই, সকলকে জাগাতেও চাই—
যে কন্টক ছিটিয়ে পথকে আকা-বাঁকা করছে...,

তার বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে বাংলার মাটিতে
অনাগত শিশুদের জন্য রেখে যেতে চাই
নিরাপদ বাসযোগ্য বাংলাদেশ।'[৭৯] (কূটচাল)

কবির আক্রমণের লক্ষ কেবল দেশের শত্রুরা নয়। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজির অবাধ প্রবেশ ঘটেছে বাংলাদেশে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে বিদেশিরাও বাংলাদেশের ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেছে। তাদের চক্রান্তেই বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পথ হয়েছে কণ্টকাকীর্ণ। সবুজ বাংলাদেশ আজ জনগণের রক্তে ভিজে, বাংলারই সুনির্মল পরিবেশকে দূষিত করছে, দেশের রাজনীতি গণতন্ত্রকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বাহান্নর যে রক্তঝরা পথে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা এনেছিল সেখানে ছেয়ে রেখেছে কেবল পরাধীনতার গ্লানি। দেশের শাসক আজ অর্থের বিনিময়ে দেশকে তুলে দিয়েছে মুক্ত বাজারনীতির দরজায়। প্রতিমুহূর্তে লুণ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশের সম্ভ্রম। সে-জন্য বিদেশিদের দেশ থেকে তাড়ানোর পরিকল্পনা করেছেন কবি—

'আমাদের জননীর গর্ভে তেল-গ্যাসের সন্ধান মেলেছে
শোষণের ইতিহাস উঠছে ফুঁসে, দস্যুর নজর কেড়েছে,
জননীর ইজ্জত-সম্পদ লুট করে নিতে ওরা জোট বেঁধেছে
জননীর সংসার অস্থির—বিদেশী শত্রুরা ঘরে ঢুকেছে।...
তোমার ইজ্জত-সম্পদ রক্ষার জন্য সন্তানেরা প্রস্তুত
তাড়াবো জেহাদ করে চিরশত্রু আবৃভার লোভী ভূত।'[৮০] (বাংলাদেশ)

কেবল বিপ্লব ফারুক নয়, একাধিক কবির কবিতাতেই মুক্তবাজার অর্থনীতির চাপে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের চিত্র ফুটে উঠেছে—

(১) 'এই দেশে
জাতির বিবেক অর্থ দিয়ে কেনা যায়...,
অসৎ ব্যক্তিরা অর্থের পাহাড় গড়ছে
ঘৃণার বদলে পাচ্ছে সম্মানিত মালা...,

অথচ সিঁধেল চোর পচে মরে জেলে,
বড়চোর মুক্ত থাকে—অর্থের দাপটে।'[৮১] (এই দেশে)

(২) 'রক্তেকেনা বাংলাদেশ, অসুন্দর নাচে তার ঘাড়ে
সেখানে দিয়েছে হানা জলজ্যান্ত বাঘ ও কুমীর
আমি তো কুড়াই সুর মাঠেমাঠে নদীর কিনারে
জলে ও ডাঙায় বাড়ে বহুমুখী শ্বাপদের ভীড়।'[৮২] (অসুন্দর নাচে)

(৩) 'আমি রুগ্ন রাজনীতির দেশে, শুভ্র বিশ্বাসের
লতা ভালোবেসে-শিথিল আকাশের অন্তহীন পটে—
ঈশ্বর খুঁজেছি শুধু।'[৮৩] (শোকহীন, স্বপ্নবিহীন)

কবি সৈকত হাবিব প্রকৃতি-প্রেমিক। রাজনীতির রক্তাঙ্গণ থেকে তাঁর জগৎ অনেক দূরে। সম্ভাবনাহীন সমাজে দাঁড়িয়ে 'তিতাশ-গোমতীর' ঢেউয়েই আচ্ছন্ন থাকে তাঁর চৈতন্যভূমি। প্রকৃতির ফুল-জল, ঘাস-লতা, ধুলো-বালি, বিষণ্নতাকে নিয়েই গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার জগৎ। কিন্তু সমাজকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিজের জগতে ডুবে থাকা সম্ভব হয় না। তাই আর্তের হাহাকার, সন্ত্রাসীদের উল্লাসে শহরের বাতাস ভারী হয়ে উঠলে কবির ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে কবির কাছে কৈশোরের 'তিতাশ' ভয়ংকর হয়ে ওঠে। নদীর জলে ঢেউয়ের পরিবর্তে রক্তের প্রবাহ আর শবের মিছিল লক্ষ করেন কবি। সমাজের ভণ্ডামিগুলো কবির কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। সমাজে সবাই যেব সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে আছে। এই আচরণে কবির নিজেকে ভাঁড় মনে হয়। সময় পরিস্থিতিই যে তাঁকে ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে সে-কথাও স্পষ্ট করে দেন কবি—

'আমি জন্মেছি এক জন্মহীনতায়
কারণ জন্মের কোনো সারার্থ জানি না

মৃত্যু আমার সখা আর ভাঁড়নাট্য রচি জীবনে
আর তাতেই অভিনয় করি প্রধান ভূমিকায়

কিন্তু তুমি তো নিশ্চিত জানো, ভাঁড়ামোর জন্য
নয় জন্ম আমার, আর ভাঁড়দের প্রতি ঘৃণা আজন্ম

তবু আমাকেই তুমি অবতীর্ণ করেছো ভাঁড়ের ভূমিকায়'[৮৪] (ভাঁড়)

শাহীন রেজার কবিতায় প্রকৃতি ও স্বদেশ সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। নির্মম বাস্তবতা তাঁর কবিতাকে ছুঁয়ে যায়। সমাজে প্রতিনিয়ত কবি মৃত্যুর ঘ্রাণ অনুভব করেন। সমগ্র বাংলাদেশ যেন ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, যেখানে বারুদের ঝলসানি আর বিশ্বাসের অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। কবি-আত্মা এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ডানা কাটা পাখির মতো ছটফট করে। কবি ফিরে যেতে চান তাঁর শৈশবের স্বপ্নভূমিতে। কিন্তু শান্তি পান না। গ্রাম থেকে শহর সবখানেই লাশের গন্ধ আর বারুদের ঘ্রাণ অনুভব করেন কবি—

'চলছে পা ন্যুমার্কেট থেকে নীলক্ষেত
চারপাশে সব মরা মানুষের ছায়া
আষাঢ় দুপুরে রোদ-গিলে-খাওয়া মেঘ
হাঁটছি তবুও চশমায় মোড়া চোখ।'[৮৫] (ন্যুমার্কেট থেকে নীলক্ষেত)

গ্রাম ও শহরের ভিন্ন অবস্থান থেকে সমাজকে নিরীক্ষণ করতে চেয়েছেন কবি। কিন্তু অবস্থানের পার্থক্য হলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সর্বত্রই কবি মনুষ্যত্বের পরাজয় লক্ষ করেছেন। সাধারণ মানুষও দীর্ঘদিন এই পরিবেশে থেকে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। আজ কোনো কিছুই তাঁদের বিচলিত করে না। সমাজ পরিবর্তন তাঁদের কাছে অসম্ভব কল্পনার বস্তু মাত্র।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রথম থেকেই কৃষির ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতির আগ্রাসনে কৃষিভিত্তিক এই অর্থনীতি সংকটের মুখে পড়েছে। বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় নয়ের দশকে বাংলাদেশের কৃষি ধ্বংসের মুখে পড়ে। কৃষিকে কেন্দ্র করে সরকারি উদ্যোগের অভাব এবং বেসরকারি চক্রান্তের কারণেই কৃষি-ব্যবস্থা আজ সংকটের মুখে। বেসরকারি কোম্পানি সবসময় মুনাফামুখী। বিশ্বায়নের নামে কৃষি আজ বিভিন্ন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তির অধীন। কৃষিকে বাদ দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, একথা জেনেও কৃষিকে ক্রমাগত পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। খাদ্যের চাহিদা মেটাতে জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে হাইব্রিড ফলস উৎপাদিত হচ্ছে বাংলাদেশে। এভাবেই বিদেশি শক্তি ধীরে ধীরে কৃষকের ক্ষেতে প্রবেশ করেছে। কৃষক হয়ে পড়েছে বহুজাতিক কোম্পানির গোলাম। যাঁরা উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তাঁরাই আজ অনাহারে থাকছে। পুঁজির দাপটে ফসল রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে কৃষক-সমাজকে একত্রিতভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে হবে। কৃষিক্ষেত্রকে বিদেশি কোম্পানির দাপট ও দস্যুতা থেকে রক্ষা করতে হলে কৃষককেই সচেতন হতে হবে বলে মনে করেন কবি—

> ‘কৃষকের অসর্তকতায় শস্যক্ষেত্রে ইঁদুর ঢুকেছে, বুনো ইঁদুর
> ফসল কেটে কেটে সঙ্গোপনে ঢুকিয়ে ফেলেছে কোর্তার
> গোপন পকেটে এবং গর্তে; কারো দেখা কিংবা
> বুঝে ওঠার আগেই।
> সহজ কৃষক তার প্রাপ্য হারাচ্ছে,
> বঞ্চিত হচ্ছে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে।...
> পুনশ্চ: ইঁদুর ঠেকাতে কৃষক সতর্কতার বিকল্প নেই।’[৮৬] (ইঁদুর সংকেত)

কৃষকের এই অসতর্কতার ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে মাহবুব কবির-এর কবিতায়ও। কবি অবতীর্ণ হয়েছে ভূমিহীন কৃষকের ভূমিকায়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের

সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতির দৈন্য এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি। যখন বিশ্বায়নের নামে আধুনিতার ঢেউ বাংলাদেশে প্রবেশ করেনি, অন্তত গ্রামাঞ্চলে তার আঁচ পড়েনি, তখন কৃষক মোটা ভাত-কাপড় ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করেনি। ফলে কৃষির ওপর নির্ভর করেই তাঁর দিন স্বচ্ছন্দে কেটে গেছে। কিন্তু আধুনিকতার ঢেউ কৃষকের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। যেখানে কেবলই ভোগবাদের হাতছানি। ভোগের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষিকাজ থেকে অর্জিত উপার্জন যথেষ্ট নয়, চাই আরো আরো অর্থ। ফলে কৃষিজমি বিক্রি করে কৃষক অধিক উপার্জনের আশায় শহরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু ভোগবাদী জীবনে টিকে থাকতে হলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এ-কথা ভূমিহীন কৃষক পরে উপলব্ধি করেছেন, তিনি এও বুঝেছেন যে এটা কেবল মায়ামাত্র। কোনোদিন এই চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। কিন্তু ততদিনে তিনি ভূমিহারা সর্বস্বান্ত দিনমজুর মাত্র। তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম কৃষক হতে চাইলেও, চাষাবাদের জমির অভাবে তা সম্ভব নয়। ভূমিহীন কৃষকের এই অসহায়তাকে তিন প্রজন্মের মানসিকতার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি—

> 'আমার পিতামহের মন ছিল কৃষির দিকে,
> তাই তাকে চিনেছিল মাটি ও জল।...
> আমার পিতা ও তার দুই সহোদর নেয়নি কৃষির পাঠ,
> তাই তারা বোঝেনি মাটি ও জলের ধর্ম।
> তাই পিতামহের মৃত্যুর পর
> ফসলি যত খেত চলে গেছে কৃষকের দিকে।...
> আমার মন ছুটে যেতে চায় কৃষির দিকে।
> কিন্তু হায়, এক টুকরো জমি নেই আমার,
> কোথাও আমার পিতামহের লাঙল পায় না মাটি।'[৮৭] (পিতামহের লাঙল)

ঢাকার রাজপথে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের উষ্ণ দিনে তপন বাগচীর কাব্যযাত্রার সূচনা। নয়ের দশকে তিনি পরিণত কবিমন নিয়েই কাব্যজগতে হাজির হয়েছেন। চমকপ্রদ

অর্থহীন পংক্তিবিন্যাসের তথাকথিত কবিত্বে তিনি বিশ্বাসী নন। চেতনার গভীরে ডুবে সমাজ-সমস্যার তিক্ত রসাস্বাদনে তিনি অধিক আগ্রহী। ফলে চমক সৃষ্টি বা খণ্ডবোধের প্রকাশ নয়, সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিয়েই তিনি সমাজকে অবলোকন করেছেন। সমাজের কোনো ঘটনাই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁর অন্তরে সবুজ প্রকৃতি ও রক্তাক্ত মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি একসঙ্গেই অবস্থান করে। প্রকৃতির দিকে চোখ তুলে তাকালেই তিনি যেমন কৃষ্ণচূড়া, কেতকীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হন, তেমনি সমাজের দিকে চোখ ফেরালে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ভেসে ওঠে রাজপথ, মিছিলের মুখ। নির্বিকার বাংলাদেশকে লক্ষ করেন কবি। যেখানে মানুষ চোখের নিমেষে হত্যাকারী হয়ে ওঠে, প্রকাশ্য রাজপথে ভিক্ষুককে লুঠ করে। কালের বিবর্তনে মানুষ কেবল নিজের অতীতকে ভোলেনি, ত্যাগের মহত্ত্বে পাওয়া স্বাধীনতাকেও বাংলাদেশের মানুষ মনে রাখতে পারেননি। একবিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতার এই অবক্ষয়ে কেবল বিবর্ণ ভবিষ্যৎকেই লক্ষ করেন কবি—

> ‘খোলামকুচি ভেবে যারা আমাদের প্রতি
> নাক সিটকায়
> খোঁচাখুঁচি যাদের মজ্জাগত স্বভাব—
> খান্দানি সেইসব রুই-কাতলার জন্যে
> খেটে-খাওয়া মানুষগুলি আজ
> খেপজাল হাতে প্রস্তুত।
> খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার।’[৮৮]
> (খোলাবাজার)

নয়ের দশকের শিকড়সন্ধানী কবি হেনরী স্বপন। আপন অনুভূতির অতলেই তিনি স্বচ্ছন্দ। মানসিক চিন্তার গভীর স্তর থেকে কবির যে রক্তক্ষরণ সেখানে দেশ-কাল-পাত্র মূর্ত হয়ে ওঠে। যা-কিছু আপাত সহজ, তরল বলে বিবেচিত সেগুলিকে সযত্নে এবং সচেতনভাবেই এড়িয়ে নতুন কাব্যপথ নির্মাণে তিনি বরাবর উৎসাহী। নিজের চিন্তা-কর্ম-জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে আপন সৃষ্টিকর্মকে পাঠকের কাছে উন্মুক্ত করে দেন তিনি। বাংলাদেশের অস্থির

রাজনৈতিক পটভূমিতে কবির চোখে ভেসে ওঠে 'মৃত ঝিনুক', 'খরগোশ কবি', 'রক্ত গালিচা'র মতো নেতিবাচক অনুষঙ্গগুলি। সে-জন্য বিবর্ণ সমাজের নানা অসঙ্গতি উঠে আসে কবিতায়—

'বার্ধক্য উজিয়ে ওঠে; মাঝির পাঁজর নিকানো গলিতে।
চাঁদমারি প্রতিদিন মহাশূন্যে পাড়ি দেয় খেয়া,
চাঁদোয়া পালক পালকি বেহারা। শাদাথান
মুহূর্তের কালস্রোতে ছলচ্ছল—ঘুণ পরমায়ু
বিবর্ত বর্শিতা ফোঁসে
নাগফণা ধনিচা বাতাস।'[৮৯] (কীর্তনখোলা)

সমাজের নানা অসঙ্গতি কবিদের চোখে ধরা পড়লেও তার প্রকাশভঙ্গি সবসময় এক হয় না। পরিস্থিতি ও মানসিক চরিত্র অনুযায়ী কেউ শ্লোগানের আকারে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেন, কেউবা আশ্রয় নেন রূপকের। তীব্র শ্লেষের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনভাবনা ব্যক্ত করেন কেউ কেউ। রহমান হেনরী এই শ্রেণির কবি। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষকের দুর্দশা কবির নজর এড়ায়নি। কবি লক্ষ করেছেন আশ্বিনের পাকা ধান কৃষক ঘরে তুললেও সেদ্ধধানের উত্তাপ গ্রহণ করার ক্ষমতা কৃষকের নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক অনাহারেই থাকেন। অন্ধকার ভরা অনিশ্চিত জীবনে রাষ্ট্রনেতাদের প্রতিশ্রুতি কৃষকের পিঠে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে—

'আপাতত প্রতিশ্রুতি রুয়ে ভুঁই ভরে দিতে চাই;
কৃষকের ঘামে লোনা ক্রোধের ঝলক
উর্বর মাটিও পাললিক গোঙানি ছড়ায়।
চাবুকে চাবুকে প্রগতির একরাশ ক্ষুধা,
স্নেহমাখা উৎস জেগে
আঁতালে গাভীন স্বপ্ন উঁকি দেয় ফলনের পোয়াতি প্রেরণা।
পোড়জমি; ভাগ্যের অনলে জ্বলে ওঠে রেণুমাখা ছাই।'[৯০] (রেণুমাখা ছাই)

বিশ্বায়নের যুগে মানুষের ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনাও কিছুটা নড়ে গেছে। তাই ধর্মে আসক্তহীন কবির কাছে ঈশ্বর হয়ে ওঠেন 'হাইব্রিড'। শব্দটি আন্তর্জাতিক মুক্ত বাজারনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নয়ের দশকে বাংলাদেশের বাজারে দেশীয় পণ্যকে অসম প্রতিযোগিতার মুখে ফেলেছিল হাইব্রিড বা ভেজাল পণ্য। সেই ভেজালের দেশে ঈশ্বরও যেন হাইব্রিড হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মণিকোঠায় আশ্রয়লাভকারী ঈশ্বর যেন আজ ধনী সমাজের প্রতিনিধি। সাধারণ কৃষক দুর্দশার দিনে ভগবানের দর্শন পান না কিন্তু ফসল ওঠার দিনে অংশীদারিত্ব লাভের আশায় মিথ্যে সহানুভূতির পাত্র নিয়ে যীশুখ্রিস্টের ভেক ধরে হাজির হয়েছেন নকল ঈশ্বর—

'মাঠে মাঠে আরও নিরঙ্কুশ আউশের সারি
নতজানু পড়ে আছে ক্ষেতের আড়াল ধরে
খাজনার দায়ে অনাহারি।
নিষ্ঠুর চাবুকে ফাটা শরীরের দাগ
গড়িয়ে নামছে এসিডের খড়দাহ;...
ফসলের ভাগ কেটে ক্রুশ কাঁধে নিতে,
হাইব্রিড ঈশ্বর! সর্বাগ্রে আসিলেন, এই পৃথিবীতে।'[৯১] (হাইব্রিড ঈশ্বর)

সমাজ শব্দটির ব্যঞ্জনার পরিসর অনেকটাই বড়ো। রাজনৈতিক সংকট এবং অর্থনৈতিক সংকট ছাড়াও সমাজের একাধিক দিক আছে। যেমন নাগরিক অধিকারের সাম্য, ধর্মীয় অনুশাসনের অনুদারতা, ভোগপ্রবৃত্তি, কর্ম-সংস্থানের বিভিন্ন সংকট, দরিদ্রের বেঁচে থাকার সংকট প্রভৃতি। বাংলাদেশের কবিরা বিশ শতকের শেষ দশকের উপরিউক্ত প্রতিটি সমস্যাকে কবিতায় তুলে ধরেছেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটের চাপ ছিল বৃহত্তর। উপরিউক্ত দুটি উপ-অধ্যায়ে সেই দুটি দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

৩. নাগরিক ভোগবাদ

অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান যেকোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার আবশ্যিক উপাদান। কিন্তু মানুষ যেহেতু চিন্তাশীল, সে-কারণে তার জৈবিক ইতিহাসের পাশাপাশি একটা সাংস্কৃতিক ইতিহাসও তৈরি হয়েছে। বিশ্বায়ন তার এই চিন্তা-ভাবনাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। ফলে সমগ্র বিশ্বের মানুষের সামনে একে অপরকে জানবার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে, ভাবনার আকাশ ক্রমশই বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু এই জানবার সুযোগ যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের হয়েছে এমন নয়। সাধারণত কোনো দেশের কেন্দ্র ও কেন্দ্র-সংলগ্ন মানুষই শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সমাজের আবশ্যিক মৌলিক অধিকারগুলি সহজে ভোগ করে। কিন্তু প্রান্তবাসী মানুষের কাছে এই সুযোগ-সুবিধা ততটা সহজলভ্য হয় না। অনেকসময় তারা এইসব মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিতও হয়। ধীরে ধীরে কেন্দ্রবাসী মানুষের সঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্য প্রকট হতে শুরু করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় দেরিতে হলেও সেখানে বিশ্বায়নের ঢেউ এসে পড়েছে। বাংলাদেশে যাঁরা শহরে বিশেষত রাজধানী ঢাকায় বাস করেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিত্য পরিবর্তনকে তাঁরা প্রতিদিনই দেশের অন্যপ্রান্তের মানুষের তুলনায় বেশি করে অনুভব করতে পারেন। বিশ্বের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তাঁরাও একাত্ম হতে চান। এর পিছনে মুক্তবাজার অর্থনীতির ভূমিকাই সর্বাধিক। বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার করে মুক্তবাজার অর্থনীতি উন্নয়নশীল দেশের জনগণকে প্রলুব্ধ করে। এই প্ররোচনায় পা দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একসময় অন্যদেশের মানুষের চাহিদাকে নিজেদের চাহিদা বলে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু অন্যদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে নিজের দেশের আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে উপেক্ষা করে যেতে চান। এখানেই শুরু হয় সংকট। প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ওপর সেই দেশে বসবাসকারী জনগণের চাহিদা তৈরি হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষও যখন উন্নত দেশগুলির চাহিদার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নিতে চান, তখন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রয়োজন এবং অপচয়ের দিগন্ত খুলে যায়। নয়ের দশকের বাংলাদেশের

সমাজজীবনেও এই অপ্রয়োজনের চাহিদা এবং তা থেকে সৃষ্ট সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। প্রত্যহ নিত্যনতুন চাহিদা সৃষ্টি এবং নিত্যনতুন পণ্যের ব্যবহার, বাংলাদেশের জনগণ বিশেষত যাঁরা নাগরিক তাঁদেরকে ভোগবাদী করে তুলেছিল। বিশ্বায়নের ফলে যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে সেখানে দেখা গিয়েছে এই সময়কালে সুপার মার্কেট বা শপিং মলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ছোট দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুষ্টিমেয় কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল দারিদ্র্যের বিনিময়ে। যন্ত্র-প্রযুক্তির আগ্রাসনে সাধারণের কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে। সমাজসেবার নামে এন.জি.ও.-র মতো বিদেশি সংস্থার বৃদ্ধি ঘটেছে, স্থানীয় উদ্যোগে ঘাটতি পড়েছে। সাধারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণের তুলনায় পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক আধুনিক এবং বৃত্তিমুখী শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কিন্ডারগার্ডেন, কোচিং সেন্টার এবং বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, মানবসম্পদের উদ্বৃত্ততার কারণে মজুরি হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থাও এই ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পায়নি। অল্পসময়ে অধিক ফলনের জন্য বিভিন্ন কীটনাশক এবং সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে মাটির উর্বরতা দিন দিন কমেছে। বিদেশি উদ্যোগে বেসরকারি হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে ওঠায় এবং সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা অবহেলিত হওয়া, চিকিৎসা-ক্ষেত্র সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া গ্রামীণ মানুষকে এই পরিবর্তন ততটা প্রভাবিত করেনি। কিন্তু শহরের মানুষের জীবন এই পরিবর্তনের ফলে প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। নাগরিক মানুষ এই পরিবর্তনকে নিজেদের জীবনযাত্রার অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছেন এবং এই ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের কবিরাও যেহেতু অধিকাংশই নগরবাসী এবং আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত সে-কারণে তাঁরাও এই ভোগবাদের শিকার হয়েছেন। বিশ্বায়নের সুপরিকল্পিত চক্রান্তে সৃষ্ট এই ভোগবাদ কীভাবে বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, একইসঙ্গে নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছিল—সাহিত্য, বিশেষত কবিতায় তার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই সময়ের কবিরা।

বিশ্বায়নের ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের পণ্যকে এগিয়ে রাখতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি নিত্যনতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতার মন জয় করতে সদা তৎপর। তাই ফ্যামিলি-প্ল্যানের প্রসঙ্গ উঠে আসে। যেখানে সদ্যজাত শিশুও রেহাই পায় না বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুরতা থেকে—

'দিনের বেলা জন্ম নিচ্ছে যে-শিশু
তার রঙ খুব ফর্সা আর দামি হচ্ছে
খোলাবাজারের বিজ্ঞাপন তাকে তল-উপর করছে
উপর থেকে তল আর তল থেকে উপর দেখাচ্ছে।'[৯২] (দিনরাত্রির গোলকধাঁধাঁ)

মানবসন্তানের জন্ম হয় স্বাভাবিক নিয়মে। দিন বা রাতে জন্মগ্রহণের সঙ্গে শিশুটির বর্ণগত কোনো সম্পর্ক নেই। পুরোটাই সেই নবজাতকের জিনগত উত্তরাধিকার—একথা বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু বিজ্ঞাপনের খোলাবাজারে মানুষ আজ নিজের যুক্তি-বুদ্ধি বন্ধক রেখেছে লোভের কাছে। তাই প্রচারসর্বস্ব বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে সাধারণ মানুষ অন্ধকারে জন্ম বলে শিশুর গায়ের রঙ কালো এরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে বহুজাতিক কোম্পানির দ্বারস্থ হয় চমকপ্রদ কোনো তেল বা ক্রিমের আশায় যাতে কালো শিশুকে ফর্সা করে তোলা যায়। স্বাভাবিকভাবে শিশুটি ফর্সা হয় না, কিন্তু ফর্সা হওয়ার সামগ্রী বিক্রয় করে দিনদিন লাভবান হয় কোম্পানিগুলি। এভাবেই কালো মানুষদের চিন্তাগত দৈন্য প্রকাশ্যে আসে। কেবল ক্রিমের বিজ্ঞাপনেই ক্ষান্ত থাকে না কর্পোরেট শক্তি। মানুষের ভালোবাসাও আজ তাদের নিয়ান্ত্রাধীন। মানুষের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় পর্যন্ত ঠিক করে দেয় তারা। এভাবেই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে অন্যের অযাচিত প্রবেশাধিকারকে আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ মনে করে গর্বিত হয় বর্তমান প্রজন্ম। উদ্দাম যৌনতা তাদের কাছে আনন্দময় আধুনিক জীবনের অঙ্গ। তাদের এই ভাবনার অসারতা ও গভীরতাহীনতাকে ব্যঙ্গ করেছেন বাংলাদেশের কবিরা—

১) 'আমাদের প্রেমগুলো কোম্পানির বিজ্ঞাপন দিয়ে তৈরি

আমাদের সঙ্গমের দিনক্ষণগুলো ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম ঠিক করে দেয়
আমাদের ক্লিন শেভ চুমুর সঙ্গে উঠে আসে লিপিস্টিক
ও ফেয়ার এন্ড লাভলী ক্রিম
ক্লিনিকগুলো ছুরি দিয়ে পেট কেটে বের করে আনে আমাদের সন্তান
আমাদের আনন্দের আর শেষ নেই।'[৯৩] (প্রেম)

২) 'এ যুগে সবকিছুই একবার ব্যবহারযোগ্য
বলপেন
নারী
টিস্যুপেপার
ধর্মগ্রন্থ
কনডম
হালকা উপন্যাস
সেনিটারি টাওয়েল
একবার ব্যবহার করুন তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিন'[৯৪] (খেলনা যুগ)

আধুনিক মানুষ শুধু ভোগের জগতে সীমাবদ্ধ নয়, সে আত্ম-কেন্দ্রিকও বটে। সে-কারণে সে দিবারাত্র আত্মচিন্তায় মগ্ন। নিজের উন্নতিই তার কাছে সর্বাগ্রে প্রাধান্য পায়। এর জন্য সে সবকিছু ত্যাগ করতেও রাজি। মানুষের এই স্বার্থপরতাকে গাছের রূপকে তুলে ধরেছেন কবি। এই পৃথিবীতে মানুষেরও পূর্বে আবির্ভাব ঘটেছিল বৃক্ষের। এরপর জীবের বিবর্তনের পথ ধরে মানুষের আগমন ঘটেছিল পৃথিবীতে। গাছই তাকে সর্বাগ্রে শ্বাসের বাতাস দিয়েছে, প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করেছে, সূর্যের প্রখর তাপে ছায়া দিয়ে রক্ষা করেছে। এমনকি সভ্যতার শুরুতে মানুষ অরণ্যের ফলকে ভক্ষণ করে জীবন নির্বাহ করেছে। হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচতে অরণ্যের শাখায় দিনের পর দিন আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু যে-দিন মানুষ বন্য থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক হতে শুরু করেছে, তার নিত্যনতুন

চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, সে-দিন সবার আগে সে বসতি নির্মাণের জন্য মাতৃরূপী অরণ্যকে ধ্বংস করা শুরু করেছে। সে ভুলে গেছে অরণ্যের অতীত অবদানকে। তার কাছে বাস্তবের চাহিদা প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষের এই স্বার্থপরতাই একাধিক কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে—

১) 'আমি বৃক্ষ।
আমাকে কেটে কেটে তক্তা বানাও।
চেয়ার, টেবিল, আলনা, খাট, কিংবা নৌকা বানাও।
আমি বৃক্ষ।
আমার কোনো ছায়া নেই।'[৯৫] (বৃক্ষ)

২) 'অরণ্যে খেলার মাঠ কারা যেন চালু করেছিল
এর প্রতিবাদে
বৃক্ষেরা শহরে এসে পিকেটিং করে
জবাবে করাত এলো
আগুন জ্বালাতে গিয়ে তাদের শরীর কাঠ-গুঁড়া
বাণিজ্যে বসতি লক্ষী—ইহা জানে বৃক্ষের শত্রুরা।'[৯৬] (বৃক্ষের শত্রুরা)

৩) 'চমৎকার ফার্নিচারে ভরে ওঠে ঘর-সংসার
সেখানে বৃক্ষের মাংস জ্যামিতিক পণ্য হয়ে যায়।'[৯৭] (ফার্নিচার)

মানুষ কেবল তার মাতৃরূপিণী প্রকৃতিকে ধ্বংস করেনি গোটা পক্ষী জগতের ভবিষ্যৎকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য মানুষ অরণ্য ধ্বংস করে বসতি নির্মাণ করেছে। ফলে বন্যপ্রাণী বিশেষ করে, পক্ষীকূল বাসাছাড়া হয়েছে। পাখিদের আশ্রয়স্থল গাছের কোটর, গাছের বাসা আর নেই। নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদনজনিত উষ্ণতার কারণে পাখিরা আজ ঘরছাড়া। পাখিদের বাসা ভেঙে মানুষ তৈরি

করেছে নিজেদের প্রয়োজনীয় আসবাব। আর গৃহহীন, খাদ্যহীন পাখিরা আশ্রয়ের আশায় মানুষের বসতিতে আশ্রয় নিতে চায়। পক্ষীজগতের এই অসহায়তা আর মানুষের নিষ্ঠুরতাকে পাশাপাশি উপস্থাপন করে কবিরা মানুষের নির্মমতার পাশাপাশি তাদের কৃতকর্মফলজনিত ভবিষ্যৎ পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

১) 'কুহু'-ডেকে উঠল সিসা-গলা স্বরে এক অদৃশ্য কোকিল..
সেই 'কুহু'
মোটা কাঁচ ও ভেলবেটের পরদা পার হয়ে ঢুকে পড়ল বেকুবের মতো
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসকক্ষে'[৯৮] (ফাল্গুনে)

২) 'তবুও পাখিরা আসে পুরোনো বাসার টানে কখনো কখনো...
দু'দিন থাকতে চায় ভেন্টিলেটরের ক্ষুদ্রতায়...
আমরা তাড়িয়ে দিই তাকে।
পাখিদের বাসা ভেঙে মানুষ সাজায় বাসা তার,
তবে কি মানুষ নিজে সভ্যতার শেষ ফার্নিচার।'[৯৯] (ফার্নিচার)

বিশ্বায়নের হাত ধরে মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন নিত্যসঙ্গী। সাইবার দুনিয়ার বিপুল বিস্তারের ফলে বিশ্বের একপ্রান্তে বসেই সে সারাবিশ্বের খবরকে নিমেষে করায়ত্ত করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনে মানুষ কেবল উন্নত চিন্তাভাবনার শরিক হয়নি, ভোগবাদের প্রলোভনে তার চিত্ত ক্রমশ বিকৃত হয়েছে। এই বিকৃত চিত্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পর্ণোগ্রাফির মধ্য দিয়ে। যেখানে নগ্নতা তার শৈল্পিক সীমা লঙ্ঘন করে একশ্রেণির মানুষের বিকৃত মানসিক খাদ্যে পরিণত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজে নারীর শরীরকে পণ্য করেই গড়ে উঠেছে পর্ণোগ্রাফির ব্যবসা। এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমাজের তরুণ প্রজন্ম। তাদের মানসিক বিকাশের আগেই সাইবার দুনিয়ার সৌজন্যে তারা এর স্বাদ গ্রহণ করছে। ফলে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। পর্ণোগ্রাফি মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনচর্চাকে প্রকাশ্যে এনেছে, যা দেখে

সমাজের তরুণ প্রজন্মের মনে বাসা জন্ম নিয়েছে নানা বিকৃত চিন্তা-ভাবনা। যৌবনে পা দেওয়ার আগেই বিকৃতচিন্তায় অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক তরুণ সমাজ। সেই ভোগ-বিকৃতির কথা উঠে এসেছে একাধিক কবিতায়—

১) 'নীলঘরে সহস্র ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ
কম্পিউটারের অশ্লীল স্ক্রিনজুড়ে
সাদামৃত্যুর আহ্বান
এমন ঘোর সন্ধ্যায় কে কাকে চেনে?
কে কাহাকে চিনিতে পারে!
গভীর ছন্দ ভুলে গেছে নীল কবিয়াল।'[১০০] (শিয়ালের হাসি)

২) 'মৌন শরীর যে ইশারায়
জেগে ওঠে জুয়ারীর বাজি ধরে-
রূপের আভায় যে পণ্যের চাহিদা বেড়েছে
বাগদাদে-জেরুজালেমের সরাইখানায়-
নাচবে উঠোনে রাই নিজে...'[১০১] (আমাদের শো-বিজে)

নতুন প্রজন্মের জীবনে সাইবার যুগ এক বিপ্লবের সমতুল্য। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের সূত্রে তারা একে-অপরের ভালোমন্দের ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে। মানসিক নৈকট্যের কারণে অনেকে নতুন নতুন সম্পর্কে বাঁধা পড়ছে। কিন্তু সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ না থাকায় এই সম্পর্কগুলি ক্ষণিকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই এই প্রজন্ম নতুন সম্পর্কে জড়াচ্ছে। ফলে এই যুগকে বলা যায় তাৎক্ষণিক ভালোলাগা এবং সম্পর্কে দ্রুত ইতি টানার যুগ। এখন অনেকেই প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের ভিত্তিতে সম্পর্কে জড়ায় না। মূলত সামাজিক মাধ্যমে তাদের একে-অপরের ভালোমন্দের ঐক্যের ভিত্তিতে তারা ডেটিং-এ যায়। সম্পর্ক তৈরি হলে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ইন এ রিলেশনশিপ', আর সম্পর্ক ভেঙে গেলেই 'সিঙ্গেল' স্ট্যাটাস দিয়েই তারা সম্পর্কের দায়ভার

থেকে মুক্ত হয়। তাদের 'সম্পর্ক' ভাঙার সঙ্গে এই 'হৃদয় ভাঙা'র কোনো সম্পর্ক নেই। এভাবেই আধুনিক প্রজন্ম পারিবারিক স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের প্রতি আসক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পারিপার্শ্বিক সমাজের বন্ধুদের তুলনায় সাইবার দুনিয়ার অপরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তাদের কাছে আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাইবার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরলেই সব যেন কেমন স্বপ্নের মতো মনে হয় এই প্রজন্মের কাছে। সেই স্বপ্নজগতের সন্ধান দিয়েছেন কবির হুমায়ুন—

'সাইবার তরঙ্গ রেখে ফিরে এলে প্রিয় মুখগুলো হাওয়ায়
কথা বলে। পথে-প্রান্তরে অচেনা অতিথি স্যাঙাৎ।
স্যুয়ে ইউয়েন! স্যুয়ে ইউয়েন!!
বুকে তার রাতজাগা তক্ষক চোখ। এ চোখ; পরবাসী চোখ,
তবুও তো মানুষের চোখ!
সেগুঞ্চরি পাতার রক্ষত্বকে লুকিয়ে পড়ে সভ্যতার লাবণ্য
বহুভাষী হট্টগোলে অনূদিত—আড্ডায় তালিবাজে—নিহাও নিহাও!'[১০২] (স্যুয়ে ইউয়েন)

ভাষা যেকোনো জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দলিল। বাংলা ভাষায় কথা বলা বাঙালি জাতি, পৃথিবীর বুকে গৌরবময় স্থান অধিকার করে নিয়েছে ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ভাষা-কেন্দ্রিক এই জাতিসত্তাকে রক্ষা করা যেমন রাষ্ট্রের কর্তব্য, তেমনি প্রতিটি বাঙালিকেও জাতিগতভাবে সচেতন হতে হবে, মাথায় রাখতে হবে তার ভাষাগত ঐতিহ্যকে। এই ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে তার আত্মপরিচয়ের প্রমাণপত্রস্বরূপ। কিন্তু যে বাংলা ভাষা বাঙালির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, তাকে উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অনর্থক আসক্তিই ধীরে ধীরে বাঙালির নিজস্ব জাতিচেতনাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। বিশ্বায়নের উন্মুক্ত হাওয়ায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভুলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মেতে উঠেছে নতুন প্রজন্ম। যে হাওয়া আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তে সৃষ্ট এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাদের প্রভাব বিস্তারে ব্যগ্র। এভাবেই ভোগবাদ মানুষের আত্মপরিচয় ভুলিয়ে

দিয়েছে। আধুনিকতার নামে বাংলাদেশের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে যাওয়াকে ব্যঙ্গ করেছেন সে-দেশের কবিরা—

১) ‘জন্মসূত্রে একটা নাম আমারও ছিলো....
অথচ প্রদত্ত নাম নেই আর আমাদের
চেনা নামে ডাকলে কেউই বুঝতে পারি না
কেননা ছিনিয়ে নিয়েছে সত্তার সবটুকু একদল
দাঁতাল হায়েনা;
আমরা এখন আলাদা কেউ না; আর তাই
ভিন্ন কোনো নাম নেই,
আজ থেকে
আমাদের সম্মিলিত নাম প্রজন্ম চত্বর।’[১০৩] (নাম)

২) ‘উৎসর্গ করতে গিয়ে দেখি
অক্ষরগুলো নড়েচড়ে শেষমেষ উড়ে চলে যায়
নামহীন বেদনার দেশে
অবশেষে আমাদের নৌকা পৌঁছায়’[১০৪] (ব্যথা)

মানুষ কেবল নিজের জাতিসত্তাকে ভোলেনি, আধুনিকতার অহংকারে সে তার প্রাণের প্রিয় বাংলা ভাষাকে ভুলতে বসেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিশ্বে ইংরেজি ভাষার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ার কারণে, বাংলা ভাষা বাংলাদেশে নামমাত্র রাষ্ট্রভাষায় আবদ্ধ থেকেছে। সরকারি কাজকর্ম ছাড়াও বহুক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজি ভাষার প্রভাব দিনদিন বেড়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষিত প্রজন্মের হাতে বাংলা ভাষার বিকৃতি ঘটেছে। তারা ইংরেজি ও বাংলার মিশ্রণে এমন এক অদ্ভুত ভাষা সৃষ্টি করেছে যাকে ব্যঙ্গ করে নাম দেওয়া হয়েছে ‘বাংলিশ’। পশ্চিমী সংস্কৃতির আধিপত্যে এবং ইংরেজির প্রতি দুর্বলতার কারণে বাঙালি বাংলা ভাষাকে কেবল বিকৃত

করেনি, অপমান করেছে ভাষা-আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকেও। যে-দেশের মানুষ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে পৃথিবীর বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সেই দেশের মানুষের বাংলা ভাষার প্রতি এই অনাদর, অবহেলাকে মানতে পারেন না কবি মারুফ রায়হান। তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে বাঙালির বিদেশি ভাষাপ্রেম এবং বাংলা ভাষার অবমাননা—

'ভাষা কি কেবলই ভাষা
ভাষা মানে দেশ মানে জাতি—অকৃত্রিম উৎসমূল
তবু দেখ নিজের ভীটেয় মাতৃভাষা উপেক্ষায় হতবাক
সন্তানেরা সব হীনম্মন্য-জানে না বানান, ব্যাকরণ,
বাক্যগঠনের রীতি, শুদ্ধ উচ্চারণ-তার নেই ভাষাবোধ
বাণিজ্য সন্ধানে ভিন্ন ভাষার বাহক তারা সব
অহঙ্কারী ইউরোপগামী
দ্যাখো ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে কবি বসে আছেন একাকী
ভাষা তাঁর হাতে পদ্মফুল হয়ে ফোটে একুশের ভোরে।'[১০৫] (একুশে ফেব্রুয়ারি ২০০০)

বিশ্বায়নের নামে বাংলাদেশের মানুষ কেবল নিজের ভাষাগত জাতিসত্তাকে ভোলেননি, স্বাভাবিক জীবনধর্মকেও ভুলতে বসেছেন। ভোগবাদের ডামাডোলে চারিদিকেই কেবল 'আরো চাই আরো চাই' ধ্বনি। অর্থের দাপটে একশ্রেণির মানুষ বর্তমান বিশ্বকে নির্মমভাবে শোষণ করছে। ক্ষমতার অপব্যবহারে অর্থ, গাড়ি, বাড়ি, এমনকি নারীও তাদের হাতের নাগালে। অর্থের দাপট আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই ভোগবাদী শক্তি সমাজকে নিজেদের প্রমোদ উদ্যানে পরিণত করেছে। কিন্তু ভোগবাদের এই ফেনিল স্রোতে গা ভাসাতে ইচ্ছুক নয় সমাজের একশ্রেণির মানুষ। তাঁদের কাছে আদর্শ, বিবেক ও নীতিহীনতার মাঝে দেওয়াল তুলে রেখেছে। কিন্তু লোভের লেলিহান শিখায়, ক্ষমতা আর অর্থের দাপটে একশ্রেণির মানুষ নারীর সম্মানকেও কিনতে চায়। আর বাধা পেলেই মনুষ্যত্বের মুখোশে ঢাকা পাশবিক সত্তা জাগ্রত হয়। আধুনিকতার আড়ালে ভোগবাদ তার

নখদন্ত বিকশিত করে। পাশবিক চিৎকারে ঢাকা পড়ে যায় মানুষের বাঁচার আর্তি। ব্যভিচারের এই বর্ণমালাও কবিতায় স্থান করে নিয়েছে—

১) ‘মাছরাঙা বক কণ্ঠিনালার হাড় গেঁথে নিয়ে যায় ঠোঁটে
কপিলার শ্রোণীহাড় যেমন নিয়েছে বণিকপুঁজির দাঁত
কে পাতে ওখানে রাত্রির ক্যাম্প মেয়েটির জীবন ঘেঁষে?
অবশিষ্ট শুধুই শরীরাংশ, ঈষৎ বাঁকা-
পশ্চিমগামী সূর্যের নিভে আসা রোদে
চুম্বনের গাঢ় মসীলেপ।’[১০৬] (কণ্ঠিনালার পাড়ে)

২) ‘জেগে দেখি কল্পনা ও সভ্যতা নাচে রে....।
আর অদূরে পাতা কুড়ানির মেয়ে
নিস্পন্দ, নিথর।
তার দেহজুড়ে ধর্ষণের ভাষা মুদ্রিত।’[১০৭] (স্মৃতিসৌধ)

৩) ‘প্রিয়তমা একবার তুলে নাও মুখের নেকাব
কে জানে কখন দেখে নারী লোভী বিদেশি বণিক।
দেশকে লুটেছে ওরা লুণ্ঠনের নেইকো হিসাব
তুমিও তো রূপবতী সেই সব লুটের প্রতীক।’[১০৮] (আমি সেই মাতাল যুবক ৪)

কবি হেনরী স্বপন গৃহস্থালির পরিত্যক্ত আজর্বনার মধ্যে যৌন খেলনা আবিষ্কার করে আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের রীতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন। বিশ্বায়ন যতই উন্নয়নশীল দেশের দরজায় কড়া নাড়ুক, প্রকাশ্য যৌনতাকে এখনও বাংলাদেশে নিষিদ্ধ বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞা বা সেন্সরবোর্ডের কাঁচি বাঙালির আকর্ষণকে কমাতে পারেনি। তাই উন্নত বিশ্বের

মতো বাংলাদেশেও দিন দিন যৌন পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। বিপরীত লিঙ্গের কৃত্রিম যৌনাঙ্গকে নিজের শারীরিক চাহিদা পরিতৃপ্তির উপায় হিসাবে ব্যবহার করা বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের লাইফস্টাইলের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজে বেড়েছে যৌন পণ্য ব্যবহারের চাহিদা। মূলত ইন্টারনেটের কল্যাণে এই ধরনের পণ্য বাংলাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। কবিতায় উঠে এসেছে সেই প্রসঙ্গ—

> ‘পরিচিত সভা খুললেই দেখবে;
> কাচের টুকরো, সিরামিক
> আলু-পটল পচন, ওষুধের শিশি,
> ব্যান্ডেজ-কাপড়, পলিথিন জুড়ে
> যোনি থেঁতলানো পুতুল-প্লাস্টিক,
> ঠোঙা আবর্জনায় মাঝে মধ্যে—
> সবকিছু আবিষ্কার করে আছে।’[১০৯] (মেয়র-মন্তাজ)

এখানে একাধিক চির-পরিচিত অনুষঙ্গকে কবি যৌন পণ্যের আনুষাঙ্গিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বিশ্বায়নের আধারে পুঁজিবাদী শক্তি প্রতিনিয়ত আক্রমণ করছে মধ্যবিত্ত বাঙালির আবেগ-অনুভূতিগুলোকে। বারংবার আক্রমণে তারা সবাইকে আয়ত্তে আনতে না পারলেও তরুণ প্রজন্মকে সাইবার দুনিয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বশবর্তী করেছে। এভাবেই তারা বাঙালির নীতি-আদর্শে ভাঙন ধরিয়েছে। তাদের আক্রমণে সমাজ ক্ষতবিক্ষত। সেই ক্ষতের তীব্রতা বোঝাতে কবি পচনের অনুষঙ্গ এনেছে। বাঙলির এই মানসিক ক্ষত সারিয়ে তোলার একমাত্র চিকিৎসা হল তাকে ভোগবাদী দুনিয়ার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা। কিন্তু কবি সব জেনেবুঝেও অসহায়। কারণ সমাজের সমস্ত ক্ষমতা আজ কেন্দ্রীভূত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে। তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই সমাজের ক্ষত সারাতে বিন্দুমাত্র উদ্যোগী নয়। তাই অক্ষমতার অনুষঙ্গ হিসাবে এসেছে ‘শূন্য ওষুধের শিশি’ এবং ‘ব্যান্ডেজ-কাপড়’। এভাবেই ধীরে ধীরে সমস্ত সমাজ ভোগবাদের করাল থাবার

আক্রমণে ক্রমশ আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে যৌন খেলনা আর একটি প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তা হল মানুষের জীবনের জটিলতা এবং ব্যক্তিগত অবসর সময়ের সংক্ষিপ্ততা। এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, কর্পোরেট অর্থনীতির চাপে নিজের সঙ্গীর সঙ্গে ব্যক্তিগত মুহূর্ত কাটানোর সময়ের অভাব বলেই সে যৌন খেলনার মতো স্বমেহন পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছে। আধুনিক জীবনযাপনের মান ধরে রাখার জন্য মানুষ আজ যন্ত্রের মতো দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছে। অর্থই তার কাছে শেষ কথা। দিনের শেষে কর্পোরেট সংস্থার যন্ত্রমানব যখন পরের দিনের একগুচ্ছ কাজ নিয়ে বাড়ি ফেরে তখন তার কাছে ব্যক্তিগত অবসর বলে কিছু থাকে না। তার মাথায় পরের দিনের কাজকে সম্পূর্ণ করার চাপা উত্তেজনা থাকে। কারণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ না হলে যন্ত্রমানবকে ছাঁটাই হতে হবে। সে-কারণে আধুনিক মানুষ দিনের শেষে বাড়ি ফিরেও পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। দিনের পর দিন অসুস্থ ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তার জীবন থেকে হারিয়ে যেতে থাকে মূল্যবান অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো। মানুষের সেই জীবনসঙ্কটকে ধারণ করেছে কবিতা—

‘একই শয্যায় পাশাপাশি থাকে আমাদের যৌনতা
মানবিক নয় যেন দূর গ্রহে অতিলৌকিক লতা
শয্যার বালু তোলপাড় করে গ্রাস করে পরমায়ু
সিল্কের শাড়ি চেটেপুটে খায় কক্ষের শেষ বায়ু’[১১০] (শয্যা পর্ব)

আসলে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতিকে। আর অর্থনীতি জনজীবনকে প্রভাবিত করে। সে-জন্য মানুষের ব্যক্তিজীবনেও যে পরোক্ষভাবে রাজনীতিরই ভূমিকা আছে সে-কথা বোঝাতেই কবিরা উপরিউক্ত প্রসঙ্গগুলিকে কবিতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন।

কবি রিষিণ পরিমল ভোগবাদী মানুষের আকাশচুম্বী প্রত্যাশাকে আবাসন সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে আকাশকে ছোঁয়ার স্পর্ধা দেখায়। নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে সামাজিক ব্যবধান রাখতে সে আজ বহুতল ফ্ল্যাট সংস্কৃতির সদস্য। বাংলাদেশে দিন দিন জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু

ভৌগোলিক পরিসর বৃদ্ধির উপায় নেই। সুতরাং বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ মেটাতে কৃষিজমিকে আবাসন নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে নষ্ট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য। শুধু তাই নয় আবাসন সংস্কৃতি মানুষের সম্পর্কগুলিকেও নষ্ট করছে। প্রকৃতি আর মানুষের সংযোগের মাঝে দেওয়ালের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এই সমস্ত বহুতল আবাসন। মানুষের দৃশ্যপটকেও সীমিত করে ফেলেছে এইগুলি। মানুষ আজ বহুতল আবাসনের আস্ফালনে আকাশকেও ঠিকমতো দেখতে পায় না। তা যেন বিক্রি হয়ে গেছে বহুজাতিক আবাসন ব্যবসায়ীদের কাছে। সে-কারণে বহু কবির উচ্চারণে ব্যঙ্গোক্তি ঝরে পড়েছে—

১) ‘মতিঝিলে দাঁড়ানো বাস
বাসের গ্লাসে দশতলা দস্যুদালান
এর চেয়ে গভীর উদার ছিলো ঘোড়াগাড়ির ঢাকেশ্বরী।
তুমি বললে, ‘না’,
-আমাদের টাওয়ার সভ্যতা কাঞ্চা সুবর্ণ
কথাক্লান্ত কবি পুনশ্চ বলি,
-গভীর উদার ছিলো অশ্বারোহী ঢাকেশ্বরী।’[১১১] (পুনশ্চ)

২) ‘আকাশ অক্‌শানে বিক্রি হয়ে গেছে ফ্ল্যাটব্যবসায়ীদের হাতে
সমুদ্র এখন বহুজাতিকদের যথেচ্ছ চিংড়ির ঘের
প্রতিটি কবির পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে নেড়িকুত্তার দল
এখন দুন্দুভি বাজাবো, সেই উন্মাতাল যুদ্ধক্ষেত্র কই?’[১১২] (অনন্ত নাগের গল্প)

৩) ‘আমি, তোমার আকাশটুকু কেড়ে নিয়েছি, তুমি আমার
তোমার গা ঘেঁসে আমি বাড়ি বানিয়েছি-তুমি তুলেছ দেয়াল।

কখনো কখনো রাত আর মাঝে মাঝে দিনগুলো পরবাসী হয়
কিন্তু দুঃস্বপ্ন আর সাধারণ চোখের তারায় স্বতঃস্ফূর্ত খেলে যায়।'[১১৩]
(অপহৃত আকাশ)

এখানে কবিরা আবাসন সংস্কৃতির সমালোচনা করেছেন। যখন বিশ্বায়নের হাওয়া বাংলাদেশের শহরে প্রবেশ করেনি, তখন বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতির হাওয়ায় উন্মুক্ত শ্বাস নেওয়ার জন্য, বাংলাদেশকে দুচোখ ভরে দেখবার জন্য ঘোড়াগাড়ি ব্যবহার করতেন। কিন্তু নতুন প্রজন্ম একথা মানতে নারাজ। তাদের কাছে টাওয়ার সভ্যতাই প্রাধান্য পায়। তারা বহুতল থেকে সমাজকে, প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু তাদের এই দেখা এককৌণিক। তাদের কাছে আকাশ ক্ষুদ্র, চাঁদ অর্ধাকৃতি। এতে বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু নতুন প্রজন্ম এই বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী নয়। তাদের কাছে প্রকৃতির কলতান, মানুষের চিৎকার উৎপাততুল্য। সে তুলনায় ঝঞ্ঝাটহীন, ক্লিনসিটি মহানগর অধিক পছন্দের। অর্থের লিপ্সা আর নিত্যনতুন চাহিদা তার দৃষ্টি শক্তিকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিক্ষেপ করেছে সমাজের পঙ্কিল স্রোতে। সেখানেই তার আনন্দ। যেখানে প্রতিনিয়ত রুপি-ডলারের ঝংকার, চারিদিকেই রূপের ভণিতা। মাফিয়ারা প্রতিদিন সভ্যতার মগজ ধোলাই করে চলেছে, আর নপুংসক প্রজন্ম অবক্ষয়কে আধুনিকতা মনে করে বিজয়-উৎসবে সামিল হয়েছে। মানব-সভ্যতা আজ আপাদমস্তক অনাচারে নিমজ্জিত। সীমান্তের কাঁটাতার কেবল বিভাজনের রেখা টানেনি, আধুনিক মানুষও আজ আধুনিকতার নামে প্রতিটি মানবিক সম্পর্কের মাঝে বিভেদ গড়ে তুলেছে, সে আজ সমগ্রতায় নয়, খণ্ডিত দর্শনে আস্থাশীল। তার এই দর্শন গড়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ি বিশ্বায়নের নামে ভোগবাদী আধুনিকতা। তাই আর্তনাদের স্বরে কবি বলেন—

''বিভাজন', 'বিভাজন' চিৎকার চারিদিকে
উল্লাসে রণনীতি বিভক্তি-গান
'রাষ্ট্র', 'রাষ্ট্র' নামে পৃথিবীর মাটি
'পরিবারে-পরিবারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভাজিত, বাটাবাটি!

হায়, অতীব উন্নত সভ্যতা

সীমান্ত-পথরেখা ধরে এ কেমন মস্তক খণ্ডন!'[১১৪] (বিভাজন)

বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ঘটেছে। পাশ্চাত্যের নিত্যনতুন আবিষ্কারের কারণে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বায়নের গুণমুগ্ধ ভক্ত। মানুষের চাহিদা যতদিন সংযত ছিল, যন্ত্রের প্রয়োজনও ছিল সীমাবদ্ধ। যন্ত্রকে কেন্দ্র করে শিল্পসৃষ্টির সম্ভবনা তৈরি হয়নি। কিন্তু আধুনিকতার নামে মানুষের চাহিদার পারদ আজ উর্ধ্বমুখী। ফলে যন্ত্রের প্রয়োজন বেড়েছে, যন্ত্র পরিণত হয়েছে যন্ত্রশিল্পে। যন্ত্রশক্তিকে আয়ত্ত করেই মানুষ সমগ্র বিশ্বকে করায়ত্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রের পিছনে নিজের বৌদ্ধিক শ্রমের অপচয় করতে করতে মানুষ আজ যন্ত্রের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বসেছে। যে যন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার কেন্দ্রে বসিয়েছিল সেই যন্ত্রই হয়ে উঠেছে মানুষের ভাগ্যবিধাতা। যন্ত্র আজ যন্ত্রীর আসনে। যন্ত্রের দাপটে আর অর্থের লোভে মানুষ নিজেই যন্ত্র হয়ে পড়েছে। তার চোখে কোনো রঙিন স্বপ্ন নেই। সে কেবলই অর্থের বিনিময়ে কর্মরত একজন যন্ত্রশ্রমিক। তার ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে-কারণে আবেগ-অনুভূতিসমৃদ্ধ মানুষদের এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে চায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। পুঁজিবাদী শক্তির এই আগ্রাসনকে স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা রাজহাঁসের প্রচলিত লোককাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কবি—

'সোহানের রাজহাঁস রাত জেগে স্বপ্ন দেখে। সোহান তাতে মোটেই খুশি
নয়। সোহান ডিম চায়, ফুলবয়েল এক একটি ডিম প্রতি সকালে
সোহানের রাজহাঁস স্বপ্ন দেখে। ডিম পাড়ে না। রাজহাঁস
পুরনো পুকুরে সারাদিন স্নান করে, রাজহাঁসের পালকে ভেসে ওঠে
রাজ্যের ছবি। পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সোহান যদিও দেখে, তবু তার
মন ভরে না। একদা সোহান প্রতিজ্ঞা করে-ডিম যদি নাই দাও
তোমাকেই খাবো। অতঃপর রাজহাঁস সোহানের পেটে'[১১৫] (নৈরাজ্যবাদ)

এভাবেই মানুষকে প্রতিদিন যন্ত্রের মতো নিংড়ে নিতে চায় পুঁজিবাদী শক্তি, তার সমস্ত সজীবতাকে শোষণ করার পর তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে পরিত্যক্ত আবর্জনার মতোই ত্যাগ করে আধুনিক সমাজ। যে-সমাজকে একদিন সে তার উন্নত জীবনযাপনের মাপকাঠি ভেবে গর্বিত হত, আজ সেই সমাজে সে মূল্যহীন, অচল বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবেই নৈরাজ্যবাদ, ভোগবাদের আড়ালে ধীরে ধীরে অবক্ষয় তার জাল বিস্তার করে।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন যতই প্রগতিশীলভাবে নিজেকে উপস্থিত করুক না কেন, তা আসলে পুরুষতান্ত্রিক ভাবনায় আবদ্ধ থেকে গেছে। যুগ এগিয়েছে কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীলতার খোলস ছেড়ে মানুষ বেরোতে পারেনি। চিন্তাভাবনায় আজও মানুষ যেন পৌরাণিক যুগেই আটকে আছে। এই সমাজ প্রকাশ্যে নারী স্বাধীনতার কথা বললেও তার কাছে নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। অতীতে অস্তিত্ব রক্ষা এবং বংশ বিস্তারের তাগিদে এক গোত্রের মানুষ, হরণ (বিশেষরূপে বহন বা বিবাহ) করে আনত অন্য গোত্রের মহিলাদের। তখন মহিলাদের একমাত্র কাজ ছিল সন্তান উৎপাদন করা। তাকে সামাজিক শিকলে আটকে পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হত। বর্বর যুগের অবসান হলেও মানুষ তার বর্বর মানসিকতাকে একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি। তাই সে-দিন থেকে নারীর যে অত্যাচারের ইতিহাস রচিত হয়েছে, আজকের সমাজেও কবি সেই নিয়মকেই বলবৎ থাকতে দেখেছেন। আজও নারীর মাতৃত্বকে বড়ো করে দেখা হয়। সামাজিক শৃঙ্খলেই নারীকে আজও বন্দি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। মানুষের এই বর্বরতা উঠে এসেছে হাসানআল আবদুল্লাহ-র কবিতায়—

‘শোনো, মেয়েটি এখন তার শ্বশুর বাড়িতে
গণিতের গাঢ় তত্ত্ব
ইসেনিস্টাইন ক্রীটারিয়ান বা ডিভিশন অলগারিদম
তাকে পারেনি রেহাই দিতে
সন্তান উৎপাদন যন্ত্রে

পরিণত হওয়া থেকে এতোটুকু!'[১১৬] (বান্ধবীর চিঠি)

মানব সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি হয়েছিল বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করেই। বিজ্ঞান কেবল মানুষকে আধুনিক করেনি, যন্ত্রের অতিব্যবহারে মানুষের কায়িক শ্রমের প্রয়োজন কমেছে। কিন্তু শ্রম লাঘবের পাশাপাশি শ্রমিকের চাহিদা কমেছে। এ-কারণে বেকারত্ব বেড়েছে। শুধু তাই নয় নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহারে মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে, ক্যানসারের মতো মারণ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ওজনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আধুনিক মানুষ আজ আবিষ্কার করেছে ট্যাঙ্ক, কামান ও মর্টার। কারণ আজ তার লড়াই গ্রহ থেকে গ্রহান্তর দখলের। এছাড়াও মানুষের তৈরি পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারও মানব সভ্যতার পক্ষে যে কোনো মুহূর্তে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ভয়াবহ স্মৃতি আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে মানুষ অতীতকে জেনে বুঝেও অস্বীকার করতে চায়। বড়ো হয়ে ওঠে তার অহংকার। যে বিজ্ঞান মানব সভ্যতাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে, সেই বিজ্ঞান আজ মানব সভ্যতার বিনষ্টিতে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে হয়ত এক সময় পৃথিবী থেকে মানবজাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমন আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন কবি সৈকত হাবিব—

'এবং একুশ শ পঞ্চাশ সালে যখন আমি
পৃথিবীতে পৌঁছালাম, তখন খাঁখাঁ রোদ্দুর
আমি অচেনা, অজ্ঞাত কেউ
পৃথিবীতে কোনো দেশ নেই আজ, গ্রাম নেই,
মানুষের স্মৃতি নেই'[১১৭] (মহাশূন্য থেকে ফিরে)

বিশ্বায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা রাষ্ট্রের নিজস্ব কাঠামোকে অবলুপ্ত করে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটায়। ফলে এমন একটি রাষ্ট্র-কাঠামো বা সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি হয়েছে, যার কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নেই। দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে জন্ম নিয়েছে একটি বিশ্বসম্প্রদায়। মানুষের জীবনযাত্রা আর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকেনি। খাদ্যাভাস-রীতিনীতি-পোশাক পরিচ্ছদে নিজস্ব ঘরানা বলে কিছু নেই। স্বতন্ত্র সীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশের মানুষের চেতনায় যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন শব্দ— মুক্ত বাজার, মুক্ত অর্থনীতি, মুক্তবিশ্ব, বিশ্বগ্রাম প্রভৃতি। কিন্তু মানুষের চিন্তা-ভাবনা যত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে, সমাজ-কাঠামো সেই হারে নিজেকে বদলাতে পারেনি। ফলে দেশীয় উৎপাদন কাঠামো, দেশীয় শিল্প ও দেশীয় প্রযুক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সুযোগে মানুষের নিত্যনতুন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুঁজিবাদী শক্তি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নিজেদের ব্যবসার ক্ষেত্র বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে। প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে গেছে বাঙালির নিজস্ব ঘরানার ক্ষুদ্র দেশীয় বস্ত্রশিল্প, কলকারখানা। গড়ে ওঠেছে শপিংমল, রেস্তোরা। এভাবেই বাংলাদেশের সম্পদ চলে গেছে মুক্তবাজার সৃষ্টিকারী শক্তির হাতে। কেবল সম্পদ নয় বাঙালির চেতনাও যেন পুঁজিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বশবর্তী হয়ে পড়েছে। গ্রামের পরিবেশ বাঙালির কাছে বিরক্তিকর মনে হয়, তাই গ্রামীণ প্রজন্ম নগরমুখী হয়েছে। শহরের রঙবাহারি আলোয় তারা নিজেদের হারাতে চেয়েছে। বাংলাদেশে থেকেও বাঙালি যেন উদ্বাস্তু। যার কোনো নিজস্ব ঘর নেই। কারণ যে ঘর আছে সেখানে বাঙালিত্বের লেশমাত্র নেই। সবকিছুতেই বিদেশি কোম্পানির ব্যবসায়িক ছাপ স্পষ্ট। শিকড়চ্যুত বাঙালির চেতনা ও সম্পদের যুগ্ম লুণ্ঠনকে, তার অস্তিত্বহীনতাকে কবিতায় উপস্থাপিত করেছেন বাংলাদেশের কবিরা—

১) ‘চিকিৎসা সেবার নামে চলছে মঘা ইউনানি, নগরের কতিপয় কুমারী নিজেদের
ঠেলে দিচ্ছে বাহারি আলোয় পার্কে-পার্লারে, কাঁচি হাতে কালো খোঁপার গুণাগুণ
চেখে দেখছে আল্ট্রামডার্ন বিউটিশিয়ান, বিউটিশিয়ানের বিউটিতে বড় ঝাঁঝ
যৌনতাময়।’[১১৮] (নগরায়ন)

২) ‘এই কাল বিশ্বায়নের-বাণিজ্য অবাধ

পৃথিবীর মহাজনী নীতি এই-
ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ বিশ্বময়;

পাড়ায় পাড়ায় ইদানিং এনজিও হচ্ছে কোম্পানি আসছে
আমরা হাওয়া দিচ্ছি খাওয়া খাচ্ছি তেল মাখছি তেল দিচ্ছি

শূন্য হচ্ছে আমাদের গোলাঘর!'[১১৯] (গোলাঘর)

৩) 'এবার, লিখে রাখছি বনভূমি, অথচ লোকালয়ে
আমার কোনো শেকড়ও নেই, ডানাও নেই...পাখি!
লিখে রাখছি দু'একটা দিন রৌদ্রহীন...দূরে
আমি যে এই বাড়িতে থাকি—বাড়িটাও ভবঘুরে!'[১২০] (সাদা কবিতা)

৪) 'কুকুর বিড়াল গরু মহিষের বাথান
টেলিফোনে বিদ্যুৎ এবং গ্যাস লাইন
কাঁচাবাজার সুপার মার্কেট এবং ওয়াসার বিল
বাজারের ব্যাগ হাতে গিন্নি ও কর্তার হাত
বেগুন পটল মাছ মাংস ও হাড়
কাঁপে'[১২১] (স্থিরচিত্র)

৫) 'কার্ডফোনে সঙ্গম সারে নিসর্গ ও নারী
কিন্ডারগার্ডেন ঝুলনায় দোল খায়
লাল
মাফলার

মানুষের মাইফেলে কষ্টের কবন্ধ

মুক্তির

নৃমুণ্ড

খোঁজে।'[১২২] (বিবমিষা)

সবমিলিয়ে বলা যায় বিশ্বায়ন পুঁজিবাদকে সঙ্গে নিয়ে কেবল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় প্রবেশ করেনি, মানুষের চেতনার জগতেও তার ভোগবাদী জাল বিস্তার করেছে। কেবল সমাজের বিশ্বায়ন ঘটেনি, ব্যক্তি মানুষেরও বিশ্বায়ন ঘটেছে। বাঙালি সংস্কৃতিকে গ্রাস করার পাশাপাশি বাঙালি কী খাবে, কী করবে তাও ঠিক করে দিয়েছে পুঁজিবাদী শক্তি। বাংলাদেশের জনগণও বিশ্বায়নের এই আস্ফালনের কাছে নতিস্বীকার করেছেন। ব্যবসায়িক স্বার্থ কায়েম রাখতে নিত্যদিন নতুন নতুন ভোগ্যপণের চাহিদা সৃষ্টি করা এবং মানুষকে তার সঙ্গে অভ্যস্ত করানোই বিশ্বায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কাজে সে পূর্ণমাত্রায় সফল। মানবসম্পদই সামাজিক উন্নতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু রক্তমাংসের মানুষের সামনে কৃত্রিম ভোগবিশ্বকে উপস্থাপন করে পুঁজিবাদী শক্তি সেই মানবসম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। সে-কারণে বাংলাদেশ ক্রমশই আর্থ-সামাজিকভাবে, সংস্কৃতিগতভাবে উন্নত দেশগুলির কাছে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। আলোচ্য উপ-অধ্যায়ে ভোগবাদের বিচিত্র কৌশল এবং তার জন্য বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জীবনের অনিবার্য সংকটকে এই সময়পর্বের কবিতা-পর্যালোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হল। অনেক পাঠক মনে করতে পারেন এই কবিতাগুলির কাব্যভাষা তার ব্যঞ্জনা হারিয়েছে। এ-বিষয়ে ভিন্ন মতের অবকাশ থাকতে পারে। এই কালপর্বের প্রযুক্তিনির্ভর ভোগবাদী মানসিকতা প্রকাশে ভাষায় বহুসংখ্যক নতুন বিদেশি শব্দের প্রয়োগ অনিবার্য। পূর্ববর্তী প্রজন্মের শোভন-মধুর উপলব্ধির ব্যঞ্জনা যে ভাষায় স্বাভাবিক ছিল, তা দিয়ে এই সময়ের পরিবর্তিত যাপনকে প্রকাশ করা যাবে না। এই সময়ের কবিতা পাঠের জন্য পাঠক-মনকে অন্যভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে।

৪. সময়ের উপজাত--নিঃসঙ্গতাবোধ

বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়েও আধুনিক মানুষ একাকী, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী। কারণ বিশ্বায়ন মানব সভ্যতার কল্যাণ তথা অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও, তার নেতিবাচক দিকগুলি একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। বিশ্বায়নের ফলে দেশীয় সীমা অতিক্রম করে পণ্যসামগ্রী, সেবা, তথ্যের সচলতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদারও দিন দিন বৃদ্ধি ঘটেছে। অন্তহীন এই চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয় জেনেও আধুনিক মানুষ ক্রমাগত এই বাসনার পিছনে ছুটে চলেছে। এক সময় সে বুঝেছে এই চাহিদার বেশিরভাগই আসলে প্রতিদিনের জীবনে অপ্রয়োজনীয়। এই ভোগবাদী সমাজে সে একজন অসুস্থ প্রতিযোগী মাত্র। ফেরার চিন্তা করলেও তার পক্ষে পুরানো অবস্থানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক সমাজের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবলই নিজের জগতে আত্মমগ্ন থাকার ফলে তার চারপাশের মানবিক সম্পর্কের বন্ধনগুলি তারই অজান্তে শিথিল হয়ে পড়েছে। সমাজে সে আজ বিচ্ছিন্ন, একা। মূলত এই কারণেই আধুনিক সমাজে বিচ্ছিন্নতা অন্যতম সঙ্কটে পরিণত হয়েছে। পুঁজিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অভিঘাতে ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধের অপমৃত্যু ঘটেছে। বিবেক, নীতিবোধ, আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে আধুনিক ব্যক্তিমানুষ সমাজ-সংসার বিচ্ছিন্ন ভিনগ্রহের জীবমাত্র। এই নিঃসঙ্গতা তাকে ক্রমশই জটিল করে তুলেছে। তার চৈতন্যের গভীরে জন্ম নিয়েছে হতাশা, অবক্ষয়, গ্লানি। পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ ও আর্থ-সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েই মানুষ এই বিচ্ছিন্নতার জ্বালা ভোগ করে চলেছে। নয়ের দশকে দাঁড়িয়ে সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে কবিরা পুঁজিবাদী সমাজের নির্মমতা এবং নাগরিক জীবনের বিকৃতি ও অবক্ষয় দেখে বিষণ্নতাবোধে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের সংবেদনশীল মনে বাসা বেঁধেছে নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব। কবিতার বিষয় ও প্রকরণে কবিরা এই বিচ্ছিন্নতার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

কবি আহমেদ স্বপন মাহমুদ যুগযন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হলেও তাঁর সামাজিক চেতনা একেবারে লুপ্ত হয়নি। দ্বৈতসত্তার টানাপোড়েনে তিনি ক্রমাগতই ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। ভোগবাদের হাওয়া যখন কবির চেতনাকে আচ্ছন্ন করেনি তখনও পর্যন্ত কবির দুটি সত্তা পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে। কিন্তু আজ কবি আমিত্বের দ্বন্দ্বে জর্জরিত। কবির অন্তরাত্মা না চাইলেও কবিকে যুগের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য সমাজের স্রোতে গা ভাসাতে হয়েছে। আজ কবির অন্তরাত্মা নিস্তেজ। ভোগবাদী সমাজের বিরুদ্ধস্রোতে যাওয়ার লেশমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। চারিদিকেই কেবল হতাশার ছায়া। অপূর্ণ বাসনার পিছনে ছুটে চলতে চলতে ভালোবাসার মৃত্যু ঘটেছে, জন্ম নিয়েছে হতাশা। কবি বিচ্ছিন্ন হয়েছেন সমাজ থেকে, নিজের থেকেও—

'আমি ও শ্বেতপক্ষী পাশাপাশি থাকি—
একই আকাশে
কেউ দেখি না কারো....; আকাশ অভিন্ন হলেও
হৃদয় ভিন্ন ভিন্ন হয়।'[১২৩] (ব্যবধান)

অন্তরাত্মা এবং বহিরাত্মার এই দোলাচলতা থেকেই বোঝা যায় কবিহৃদয় দীর্ঘ পরিক্রমায় বারবার উপলব্ধি করেছেন এই বিচ্ছেদের বেদনাকে। কিন্তু সুস্থির সমাজে ফেরার পথ আজ বন্ধ। হতাশার অন্ধকারেই কবি আলোর মর্ম অনুধাবন করতে পারেন। চেতনার গভীরে স্থিত কবির কানে ভেসে আসে শব্দহীন জলের কান্না। কবি ফিরতে চান প্রবলভাবে, কিন্তু ফেরা হয় না। কবির কল্পনাগুলো কেঁদে বেড়ায়, স্বপ্নগুলোর মৃত্যু ঘটে, বুকের মধ্যে জেগে ওঠে শোকের পাহাড়, সুখস্মৃতি ডানাকাটার পাখির মতো ছটফট করে দুঃখের বাস্তবে। আশা-আকাঙ্ক্ষা জীর্ণপাতার মতো ঝরে গেলে ক্লেদাক্ত হৃদয় নিয়ে কবি অনুভব করে একরাশ শূন্যতা। কবি-হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে একাকিত্বের বেদনায়—

'চিতার ভস্ম নিয়ে
আবারো হাত পাতি,—পথের বাকলে রাখি বুক
এতটা অচ্ছুত—

মুখগুলো চোখগুলো ধেয়ে আসে রাতের ডানায়
যজ্ঞের হোম নিয়ে মেতে ওঠে অবিচারী সুখ
আমার গোপন নিয়ে ঘুরি-ফিরি একা
সে আমার গোপন অসুখ।'[১২৪] (গোপন)

কিন্তু সমাজে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে কবির এরকম আচরণ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রতিনিয়ত ভেসে আসে তীব্র ধিক্কার, মিথ্যে কল্পনার ফানুস রচনার প্রতিবাদে। কৃত্রিম যান্ত্রিকতার অভিঘাতে কবিমনের কোমল চেতনাগুলো আজ নিষ্প্রাণ। আজ আর কবির হৃদয়ে বসন্তের অনুভূতি জাগে না। তবুও জীবনের প্রয়োজনে, স্নেহ-মায়ার টানে কবি সতেজ থাকার চেষ্টা করেন, প্রতিবন্ধকতার সমস্ত বেড়াজাল ছিন্ন করে ছুটে যেতে চান সুখের সীমানায়, সৃষ্টি করেন নতুন নতুন কথামালা। যেন নিয়তির সুপ্ত অভিশাপে একাকী কবি এভাবেই মনের অজান্তেই নিঃসঙ্গতাকে ভালোবেসে, বিচ্ছেদকে সঙ্গী করে, জীবনের সব বাধা-বন্ধন ছিন্ন করে ছুটে যেতে চান শূন্যলোকে—

'মাঠের ভিতরে থাকা একাগাছ যত দেখি
শূন্যতার তত বেশি পড়ি প্রেমে
গোড়ার জল কী দারুণ আগলে রাখে কালো ছায়া
একদিন সবকিছু ছেড়েছুড়ে ধুধুপথে হাঁটা দেব
শূন্য অভিলাষে।'[১২৫] (একাগাছের কবিতা)

আসলে এক ধরনের শূন্যতার দিকেই আমাদের যাত্রা। আপাতদৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে যাত্রা মনে হলেও তা আসলে জীবনচক্রেরই অংশবিশেষ। জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের প্রতিদিনের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আলো এবং অন্ধকার। অস্তিত্বের সুস্থির প্রকাশ আলো-অন্ধকার ছাড়া সম্পূর্ণতা পায় না। জন্মগ্রহণের পর থেকেই আলো-অন্ধকারের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা শুরু হয়। অন্ধকারকে অতিক্রম করে আলোর দিকেই তার যাত্রা। কিন্তু আলোকে পাওয়ার আগ্রহে মানুষ অন্ধকারকে অস্বীকার করতেও পারে না। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা জীবনের প্রকৃত সারাৎসার খুঁজতে কবি যখনই চেতনায় গভীরে

প্রবেশ করেছেন, তখই তাঁর নজরে পড়েছে মানুষের দ্বিচারিতা। যে দ্বিচারিতা কবিকে আত্মসংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সমাজের গভীরে ঢুকে কবি সমাজ-সত্যের ভাঙন টের পেয়েছেন। কবি বুঝতে পেরেছেন নিজের ভুলেই মানুষ আজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন—

'আমরা প্রতিদিন বুঝে না-বুঝে পরস্পর রচনা করি বিচ্ছিন্নতা
এছাড়া বোধ হয় কোনো কাজ নেই আমাদের
আমি বিশ্বাস করি মানুষ বারবার পাখি হতে চায়
অথচ সামান্য ভুলে কী অবলীলায় পুড়িয়ে চলি একেকটি ডানা।'[১২৬] (যাত্রা)

ব্যক্তিমানুষের এই অবক্ষয়ের কারণ তার ভারসাম্যহীনতা। এর কারণে তার অন্তরে বাসা বেধেছে মানসিক রোগ এবং মানুষ ক্রমশ আধুনিক জটিলতার নিঃসঙ্গ প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। সময়ের প্রেক্ষাপট, যুগের অসঙ্গতি, মানুষকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, কবিকেও। হতাশা, ক্লান্তি আর নৈরাশ্যে কবি প্রেম-প্রকৃতি-সমাজ এমনকি স্বীয় সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য এবং তার ভেতর-বাহির কাঠামোর দ্বন্দ্ব দেখে কবির মনে বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়েছে। তিনি পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উচ্চারণ করেছেন—

'আমি বসে থাকি মন্দিরের বারান্দায় নির্জন কুকুর
আমার সকল মাছ চুরি হয়ে গেছে আমি এক একাকী পুকুর।'[১২৭] (প্রণয়)

কবি কেবল সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হননি, নান্দনিকভাবেও তিনি নিঃসঙ্গ। তাঁর ভাবনা-চিন্তা কোনো সুস্থ সমাজ গঠনের প্রত্যাশা করে না। কারণ দ্রুত পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের সমাজ এখন অন্তঃসারশূন্য। চারিদিকে দিশাহীন, জ্ঞানশূন্য কর্মসূচি। সমাজ-ভাঙনের এই প্রক্রিয়াকে নিজের চোখে দেখছেন কবি। তাঁর সামনেই প্রতিদিন উজাড় হচ্ছে প্রতিবেশী, উদ্বাস্তু হচ্ছে কেউ কেউ। প্রাণের অন্তরে সজীবতার ঢেউ আস্তে আস্তে থিতিয়ে যাচ্ছে। পাঁজরে কেবলই ভাঙনের শব্দ অনুভব করছেন কবি। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভূমি আজ যেন আধুনিকতার শর-ক্ষেপণে ক্ষতবিক্ষত। মানবিক সম্পর্ক আজ এতটাই ভঙ্গুর যে মানুষ একা থাকতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। একান্নবর্তী পরিবার তার কাছে হাস্যকর। এ-

কারণে প্রতিদিন ভাঙছে যৌথপরিবার, আর সমাজ পরিবর্তনের এই উন্মাদনার স্রোতে গা ভাসাতে না পেরে প্রতিদিন একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে কবি-আত্মা। নব্য প্রজন্মের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে কবি স্রোতের বিপরীতে ঘা ভাসাতে চাইছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি একা—

'অথচ শিখিনি একা-বাঁচার সংগীত
দুতারে তুলেছি যুথবদ্ধতার স্বর
ভাঙছি দুহাতে আদিম অদম্য প্রস্তর
ভাসিনি প্রচল স্রোতে, একা বিপরীত।'[১২৮] (শাহরিক)

এই একাকিত্ব ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করে কবিকে। দুঃস্বপ্ন তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে চলে। নিঃসঙ্গতা তাঁর চেতনাকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছে যে স্বপ্নের মধ্যেও নিঃসঙ্গতা কবি-হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে। সময়ের বেত্রাঘাতে কবি-আত্মা অবসন্ন, নাগরিক পঙ্কিলতা লোভের লেলিহান শিখা দিয়ে লেহন করছে তাঁকে। হিংস্র বাঘের দাঁতে যেমন মুহূর্তে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় হরিণের সুন্দর শরীর, তেমনি ভোগবাদী সমাজ চারদিক থেকে লালসার শাখা-প্রশাখা মেলে কবির চেতনাকে গ্রাস করতে উদ্যত। চারিদিক থেকেই বিচিত্র ভয়, ক্লান্তি, অবসাদ ভিড় করে আসে। নিজেকে রক্ষা করতে নিজের ভেতরেই কবি নীড় তৈরি করেন। কিন্তু ক্রমাগত পারিপার্শ্বিক চাপে নিজের ওপরেই অনাস্থা তৈরি হয়। স্বহস্তে গড়া নীড়কেই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন বলে মনে হয়। একধরনের পলায়নবাদী মানসিকতা জন্ম নেয় কবির অন্তরে। কিন্তু সামাজিক প্ররোচনায় কবি পালাতে ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত হতাশাকেই নিয়তি বলে মেনে নেন—

'সূর্য ডোবার সাথেই ধীর লয়ে আঁধারের
কালো ঠোঁট পৃথিবীকে ফেলে গিলে—
ব্যাঙকে যেমন আস্তে আস্তে নিয়ে যায় সাপ
শরীরের ক্ষুধার্ত প্রকোষ্ঠে; আমি চলে গেছি
গুটি গুটি পায়ে হেঁটে আসা

ভয়ঙ্কর হতাশার জঘন্য উদরে।'[১২৯] (হতাশার জঘন্য উদরে)

হতাশাগ্রস্ত হলেও সমাজ কবিকে মুক্তি দেয় না। তীব্র অনিচ্ছাকে আশ্রয় করে কবিকে বারবার ফিরে আসতে হয় এই পচাগলা সমাজেই। চারপাশে চোখ তুলে তাকালেই কবি লক্ষ করেন সংশয়, বিচ্ছিন্নতা ও নেতিবাদ। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধনে শিথিলতা অনুভব করেন কবি। পারিপার্শ্বিক ভাঁড়ামিতে মানুষকেও পাল্টে যেতে দেখেন তিনি। যে মানুষ বাইরে শিক্ষিত, কিন্তু ভেতরে বর্বর। সভ্য মানুষের জটিল প্রেম, ভাঁড়ামি, নির্বুদ্ধিতায়, নিষ্ঠুরতায় শিকড়চ্যুত হতে থাকে মানবিক সম্পর্কগুলি। কবিসত্তা আজ দিশাহীন তরণীর মতো নদীর এক কূল থেকে অন্য কূলে ভেসে চলেছে, শৈশব আর তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আজ রূপকথার মতো মনে হয়। সম্পর্কগুলো কেমন যেন ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছে। যাদের সঙ্গে কবির দীর্ঘ দিবস-রজনীর সম্পর্ক, কোথাও যেন সেই সম্পর্কের মধ্যে অচেতনেই ফাঁক তৈরি হয়েছে। যে ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে একাকিত্ব। বেড়েছে মানসিক দূরত্ব। সেই ক্রমাগত দূরত্ব এবং নিজের বন্ধনের বৃন্তচ্যুতি বোঝাতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

'আর তারা উন্মুক্ত আকাশের নিচে রুমালের গিঁট খুলে
আজন্মের সম্পর্কগুলো বাতাসে ওড়াতে গিয়ে দেখে
কে কত রক্তাক্ত কিংবা কে কেমন বাষ্পের মতো
উড়ে যেতে যেতে- ফেল গেছে শূন্য রুমাল।'[১৩০] (সম্পর্ক)

আজ মানুষ কেবল মানবিক সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হয়নি প্রকৃতিও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এ-কথা বুঝতে পেরে সে এখন প্রবলভাবে ফিরে আসতে চাইছে প্রকৃতির কাছে। সেই আকুলতা ধরা পড়েছে কবি কাজল কানন-এর কবিতায়—

'সুহৃদ বৃক্ষ, আমাকে অধিগ্রহণ করুন
পুরনো আস্থা ভেঙে আসা আমি একবিন্দু আয়ু
ঘুমজাগরণের মধ্যস্থতায় হারিয়ে এসেছি স্মৃতি
পূর্বকোণ বাতাসে উড়ে গেছে চোখের গোধূলি
মানুষ থেকে মানুষে পৌঁছাতে ক্রন্দন লাগে

আর লাগে নিঃসঙ্গ অধিরতা'[১৩১] (বৃক্ষের কাছে)

কাল বা সময় বহমান। মানুষ এই কালস্রোতে ভাসমান। সময় আসে এবং যায়। কিন্তু সমাজ-সংসার থেকে বিযুক্ত কবি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না। তাই সময়ের আগেই থেমে যেতে হয় তাঁকে। চলমান গতিশীলতার বিপ্রতীপে এই থেমে যাওয়া জড়তা, স্থবিরতা তথা মৃত্যুর ইঙ্গিত বয়ে আনে। সময়ের গর্ভ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে কবি এমন এক অবস্থানে এসে পড়েন যেখানে স্তব্ধতাই আচ্ছন্ন সুরের চেতনা জাগায় তাঁর প্রাণে। সময় থেকে বিচ্ছিন্ন কবিমন যেন অজানার দিকে যাত্রা শুরু করে। বিস্মৃতির অতলে নিঃসঙ্গতা কবির কাছে হঠাৎ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে-কারণে অরণ্যের নির্জনতা নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হয় কবির কাছে। প্রকৃতির নীরবতা যেন কবির নিঃসঙ্গতাকে আরো বেশি করে প্রকাশ করে দেয়—

'পাখি আর আকাশের হাহাকার
অজ্ঞাত আর বিষণ্ন
অবলম্বনের মতো গুনগুন
আর এই নিঃসঙ্গ চিহ্ন ইচ্ছাহীন অস্তিত্বের ভেতর এখন
স্তব্ধতার সংকেত বাজায়।'[১৩২] (স্তব্ধতার সংকেত)

কবি হেনরী স্বপন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার অসারতাকে উপলব্ধি করেছেন। স্বাধীনতার মূল চেতনা ছিল শোষণ-বঞ্চনাহীন এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন। জনগণ ভেবেছিলেন রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ গঠিত হবে, অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের দু-দশক পরে বাংলাদেশের জনগণ বুঝতে পেরেছেন শাসক আর শোষকের রূপ বদল হয়েছে মাত্র। সময় যত এগিয়েছে সমাজে বৈষম্য আর বঞ্চনার মাত্রা তত প্রকটতর হয়েছে। তবে এই স্বপ্নভঙ্গের জন্যে কবি কেবল রাষ্ট্রের বঞ্চনা নয়, জনগণের বিবেকহীনতা ও লোভের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। বিশ্বায়নের ভোগসর্বস্ব সমাজে জনগণ কেবল পাওয়ার সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছে, সামান্য স্বার্থের লোভে নিজের মেরুদণ্ডকে ঝোঁকাতে বিন্দুমাত্র ভাবেননি। কিন্তু কবি জানেন

একসময় মানুষের এই ছুটে চলার বিরাম ঘটবে। মানুষ বুঝতে পারবে ভোগসর্বস্ব এই প্রতিযোগিতায় সে এক সামান্য প্রতিযোগী মাত্র। ছুটতে ছুটতে সে সমাজের এমন এক প্রান্তে উপনীত হবে, যেখানে সে একা, ক্লান্ত। যেখানে দাঁড়িয়ে আর উত্তরণ তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু অবনমন স্পষ্ট। এই বাঁচা-মরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার যে অনুভূতি, তাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কবি—

'নিজেকে পেন্সিল হাতে কাগজে লেপটে রাখার
উত্তেজনা ক্ষয়ে ক্ষয়ে উচ্ছন্নে হারাবে যে কাল।
শুধু নেমে যাওয়ার তরাসে
সর্বদা দাঁড়াতে ভুলে গেলি।
কস্তুরির ঘ্রাণ উড়বার স্বাধীনতা পেয়ে,
দেখ?
কীরকম।
কতোটা বাঁচবি?'[১৩৩] (স্বাধীনতা পেয়ে)

কবি সৈকত হাবিব রাত্রির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নিজের সত্তার অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ উপলব্ধি করেছেন। পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে কবিসত্তা বিচলিত নয়। কবি জীবনানন্দের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। যেখানে সহজ লোকের মতো চলা, সহজ কথা বলা অসম্ভব। আলো-অন্ধকারকে অতিক্রম করে কবি এমন এক জগতে উপস্থিত—যেখানে সকল কাজ তুচ্ছ, সকল চিন্তা-ভাবনা শূন্য, অর্থহীন, আছে শুধু গাঢ় অবসাদ আর একাকিত্ব। কবি এখানে গতানুগতিক যাপনে অভ্যস্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকাঠামো থেকে সরে এসে ব্যক্তিমানুষের অবচেতন সত্তার গভীরে আলোকপাত করেছেন, সেখানে ব্যক্তিসত্তার টানাপোড়েনে কবি ক্রমাগত বোধের তীক্ষ্ণতা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অবচেতনের আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তায় চালিত হয়েছেন। এক সময় আলো-অন্ধকার মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে এক নির্জন বিপন্ন-বিস্ময়ের জগৎ। কবি সেখানে এক নিঃসঙ্গ নাগরিক মাত্র—

'আমাকে ছুঁয়ে-ধুয়ে এনে দেয় বিষণ্নতা, শাহরিক শূন্যতা

এই রাত্রি
ধূসর নির্জ্জানে আনাগোনা করে স্মৃতি, শহর, যৌবন
এই রাত্রি আমাকে অপূর্ণ করে, নিজেকে নিজের ভিতর
অচেনা অচেনা করে।'[১৩৪] (পৃথিবীর এইসব রাত্রি)

রাত্রির এই শূন্যতা আসলে সমাজের অপূর্ণতাকেই, কবি-আত্মার অতৃপ্তিকেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামো আজন্ম শূন্যতার আবরণে আচ্ছন্ন ছিল না। এই বাংলাদেশের সম্ভবনাময় পটভূমিতেই দাঁড়িয়েই কবি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি পরিচ্ছন্ন জীবন। যে জীবনের কেন্দ্রে থাকবে নারী ও প্রেম। এই দুই উপাদানকে অবলম্বন করেই কবি জীবনের বিস্তৃর্ণ প্রেক্ষাপটে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা সঞ্চয় করবেন। কিন্তু ভগ্নহৃদয় আর ট্রাজিক বেদনাবোধ থেকে কবির মনে সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত জটিলতা। বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে অতীতের স্মৃতিচারণ করেছেন কবি—

'এইখানে ছিল গতকালও ছিল
অচল আধুলিখানা
তুমি ছিলে পাশে গাঢ় নিঃশ্বাসে
মানো নাই কোনো মানা'[১৩৫] (বিরহের পদাবলী)

এখানে 'অচল আধুলিখানা' এবং 'গাঢ় নিশ্বাস' শব্দবন্ধ দুটি লক্ষণীয়। আধুলি হল বিনিময়ের মাধ্যম, যার একটা মূল্য আছে। কিন্তু অচল শব্দে কবি সেই মূল্যের অর্থহীনতাকে ইঙ্গিত করেছেন। কেবল মূল্য নয়, মূল্যবোধের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তিনি। আদর্শবাদী যে ধ্যান-ধারণায় তিনি বিশ্বাসী, পরিবর্তনশীল সমাজে সেই ধ্যান-ধারণা, নীতিবোধ অচল। কিন্তু বদলে যাওয়া সমাজে কবি সেই পুরানো মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছেন। এ-কারণেই কবির প্রেমিকা কবিকে ছেড়ে গেছে। সেই বিচ্ছেদ-বেদনাকে তিনি 'গাঢ় নিঃশ্বাস' শব্দবন্ধে প্রকাশ করেছেন। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় নিজের চারপাশে গড়ে তুলেছেন এক অন্ধকারময় জগৎ। চাওয়া-পাওয়ার এই বিভেদ, স্বপ্ন ও বাস্তবের এই দূরত্ব থেকে কবি উপলব্ধি করেছেন—তাঁর জীবনে উত্তরণ আসেনি। তিনি যতবারই

জীবনযাপনের জন্যে ঘরবাঁধার স্বপ্ন দেখেছেন, ততবারই সেই স্বপ্ন হেঁয়ালিতে পরিণত হয়েছে। তাই গৃহহীন হয়ে, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, স্বপ্ন হারিয়ে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কবি রচনা করেছেন বিরহের পদাবলী—

'আজ দেখি ফাঁকা কিছু নাই আঁকা
সব বুঝি কোন ভুল
উদাস বাতাস স্বপ্নের হাঁস
স্মৃতি যেন এলোচুল।'[১৩৬] (ঐ)

কবি আহমেদ স্বপন মাহমুদ তাঁর 'উদ্বাস্তু' কবিতায় আদর্শগতভাবে উৎখাত মধ্যবিত্তের শ্রেণিগত বিশ্বাসঘাতকতাকে তুলে ধরেছেন। যেখানে রাত্রি কুটিল চরিত্ররূপে উপস্থিত হয়ে চক্রজাল রচনা করে, সমাজ থেকে জনগণকে বিতাড়িত করে, দুর্বৃত্তেরা সমাজে বিকার ছড়ায়। সমাজের শুভবোধসম্পন্ন মানুষ আজ নিরুদ্দেশের যাত্রী। বর্বরতার নখরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হচ্ছে রঙিন স্বপ্নগুলো। অর্ধচেতনায় কবি উপস্থিত হয়েছেন আলো-আঁধারের অদ্ভুত জগতে। সেই নির্জনতায় শৈশবের স্মৃতিচারণায় মেতে উঠেছেন কবি—

'মনে পড়ে শৈশবের ধূলোকথা
শস্যের প্রতিভা আর সবুজ আনন্দ
সন্ধ্যার কুয়াশার সাজ-
আজ নগরের আকাশ দেখে
মনে হয়, অনেক দূরত্বে ফেলেছি শৈশব।'[১৩৭] (উদ্বাস্তু)

কেবল আহমেদ স্বপন মাহমুদ নয়, কবি মতিন রায়হানও নগরের রিক্ত পথে শৈশবকে ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ আর্তি জানিয়েছেন—

'টের পাচ্ছি খুব—ক্রমশ আমিই রূপান্তর হচ্ছি
শৈশবের নিরপরাধ ফড়িং কিংবা হারপুনবিদ্ধ রক্তাক্ত মৎস্যে;
এক একটি রাত আমাকে বিদ্ধ করে যায় বিষাক্ত হারপুনে
আমি আক্রান্ত মাছটির মতোই তীব্র চিৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠি!'[১৩৮]

(শৈশবের নিরপরাধ ফড়িং)

কবি টোকন ঠাকুর লক্ষ করেছেন সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা নিজেদের স্বার্থকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়, তারাও আত্মপ্রচারের আশায় মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করার ছদ্ম-প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই দ্বিচারিতা কবিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাই নিজের নিঃসঙ্গতাকে প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত কবি বলেন—

'নিঃসঙ্গ বনের কাছে, সমুদ্রের ধারে, লোক-থই থই সমাজের মধ্যেও
নিজের অবস্থান করে নিয়েছিল সু-দৃ-ঢ়-ত-র
কিন্তু বিখ্যাত ব্যর্থতা আমার, নিঃসঙ্গ দেখতে কেমন
সেটা আজও দেখাতে পারলাম না;
অথচ, নিঃসঙ্গচর্চার তম তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
পেরিয়ে যাচ্ছে
বড়জোর একটি শব্দপ্রাপ্ত আমি, সমীক্ষা শেষে আজ মনে হয়
সেই শব্দটি নিঃসঙ্গজনক'[১৩৯] (নিঃসঙ্গজনক)

কেবল টোকন ঠাকুর নয়, বাংলাদেশের একাধিক কবি নিজেদের নিঃসঙ্গতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বহুমাত্রিকভাবে—

(১) 'বাদামের খোসা যেমন হারানো কৈশোর—বয়সের ভারে ভেঙে
গুঁড়ো গুঁড়ো— পড়ে আছে নদীপাড়ে—স্রোতেও যায় নি ভেসে—থেকে
গেছে স্মৃতিরাশি হয়ে—হীরের টুকরো যেন গতিকে বোঝে না'[১৪০] (হারানো
শৈশব ও ভাঙাগান)

(২) 'মন তো জিম্মি হয়ে আছে বর্ণচোরা দৈত্যের হাতে
বন্দীশালা খোলার চাবি দয়াল ভিন্ন চেনে কে
দয়ালের পায়ের কাছে মাথা ঠুকে মরি
সন্ত্রাসী চাঁদের পাগলামি থেকে ওদয়াল, প্লিজ বাঁচাও আমাকে'[১৪১] (সন্ত্রাসী

চাঁদের পাগলামী)

(৩) 'আমাকে জাগাও, পুনরুজ্জীবিত করো
প্রাণ দাও আমার শব্দের প্রতিটি রন্ধ্রে
আমি কামার্ত, শব্দের আঘাতে আঘাতে তপ্ত করো, শীলা,
ও প্রস্তরীভূত, শীলা।
জেগে ওঠো।'[১৪২] (শীলা দ্যুতিময়)

(৪) 'আমি বালিয়ারি নদীর তীরে বসে
সবুজ শৈশবকে নেড়েচেড়ে দেখি।
নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ জল ঝরছে কোথাও
হালকা হলুদ পাতা সময়ের অদৃশ্য সুতো ছিঁড়ে
নিঃসঙ্গ খসে পড়ে মাটিতে।'[১৪৩] (৩০ সংখ্যক কবিতা)

(৫) 'জীবনের বড় বেশি ভেতরে সে আলো জ্বেলে
একদিন বিমূঢ় বিস্ময়ে দেখেছিল
সেখানে আধার ছাড়া অন্য কিছু নেই
কবরে কাফন রেখে বিপরীত পথে
হেঁটে যায় নিঃসঙ্গ মানুষ।'[১৪৪] (নৈঃসঙ্গ)

এভাবেই কবিরা সময়ের মারে একা হয়ে পড়া মানুষদের কথা নিজের একার বেদনাবহ উচ্চারণে ফুটিয়ে তোলেন। প্রকৃতির ক্লেদ কলঙ্কের বর্ণময় বিচ্ছুরণ থেকে বাঁচতে নিজেদের চারপাশে গড়ে তোলেন পৃথক প্রাচীর। কিন্তু ক্রমাগত দহন ও পাপবোধ কবিদের পীড়িত করে। ফলে সমাজ-সংসারে মানুষের মধ্যে থেকেও তাঁরা ক্রমশ একা হয়ে পড়েন। তবে এই একা হয়ে পড়বার মধ্যেও দেখা যায় প্রচুর কবিতা লেখা হচ্ছে বাংলাদেশে। হয়তো

এই কবিতার মধ্যে দিয়েই একদিকে কবিরা তাঁদের নিঃসঙ্গতাকে প্রকাশ করেন আবার একইসঙ্গে সন্ধান করেন সম্পর্কের সেতু।

৫. ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ

ঐতিহ্যের মধ্যে জড়িয়ে থাকে একটি জাতির অহংকার, গরিমা। যখন কোনো জাতি সংকটে পড়ে, তখন অতীতের কোনো গৌরবময় প্রথা, আচারানুষ্ঠান, মতবাদ বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড—এককথায় এই সমস্ত উজ্জ্বল ঐতিহ্যই তাকে প্রেরণা দেয়, যার জোরে সেই জাতি নতুন করে বাঁচার শক্তি খুঁজে নিতে চায়, ঘুরে দাঁড়াতে চায়। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারে এবং জ্ঞানচর্চার অগ্রগতির ফলে মানুষ বন্য থেকে সভ্য হয়েছে, সভ্যতা গড়ে তুলেছে। নিজের চিন্তা-ভাবনাকে সৃজনশীল করে তোলায় সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় একেবারে আদিযুগে রচিত চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত রচিত সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত এবং সমৃদ্ধ। অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী একটি গ্রামবিশ্বে পরিণত হওয়ায় মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে বিশ্বসংস্কৃতির সান্নিধ্যলাভ করেছে। সেই সূত্রে তার সুযোগ ঘটেছে বিশ্বের নানা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করার। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে গ্রিক সাহিত্য অত্যন্ত ঋদ্ধ। বিশেষ করে গ্রিক পুরাণ এবং অতীতের নানা কিংবদন্তি যা মৌখিকভাবে চলে আসছে যাকে আমরা মিথ বলি, তা খুবই জনপ্রিয়। যদিও ভারতীয় মিথ, পুরাণ, লোকসংস্কৃতিরও একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রয়েছে। এই সমস্ত মিথ, পুরাণের মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের মানুষের গৌরবময় প্রথা, কীর্তি বা সংস্কারকে স্মরণ করে বর্তমান সমাজের সংকট থেকে মুক্তি বা সান্ত্বনা পেতে চান ক্ষয়িষ্ণু সময়ের সাহিত্যিকরা। বাংলাদেশের নয়ের দশকের কবিরাও তার ব্যতিক্রম নন। আটের দশকে বাংলাদেশের সমাজ সামরিক শাসনের আঁধারেই ঢাকা পড়েছিল। এই সময় গণতন্ত্র পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে। ফলে আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রতিমুহূর্তে ব্যহত হয়েছে। সে-কারণে নয়ের দশকে যে-সমস্ত নতুন কবি কাব্যচর্চায় উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছে সামরিক শাসনে জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত-লাঞ্ছিত, অনুর্বর সম্ভাবনাহীন বাংলাদেশকে। সমকালের এই অবক্ষয়কে কবিতার মধ্যে দিয়ে ফুটিতে তোলার জন্য কবিরা মিথ-পুরাণের পাশাপাশি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্যের উজ্জ্বল অধ্যায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বা বিষয়কে নতুন করে নির্মাণ

করতে চেয়েছেন। অতীতের মিথ-পুরাণ এবং সাহিত্যকে কবিরা কীভাবে বর্তমানের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে প্রাসঙ্গিক এবং শৈল্পিক রূপ দান করেছেন—তা এই উপ-অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

নয়ের দশকের কবি অলকা নন্দিতা সমকালীন সামাজিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে মানবজাতির বিলুপ্তির আশঙ্কা করেছেন। যুগ-যন্ত্রণায় অস্থির মানুষ নিজেই দিশাহারা। মানুষের এই পরিণতির জন্য দায়ী তারই কর্মফল। নগর সভ্যতার ক্রমাগ্রাসনে ধ্বস্ত অরণ্যজীবনের প্রতি মর্মী কবির কলম, তাই স্মৃতিপথে পদচারণা করে বলেছেন—

'আমিতো ওরাং জাতি, বৃক্ষবাসী;
বৃক্ষের পাতায় লেগে আছে
পৌরাণিক ঘ্রাণ আমার জন্মের।
পূর্বে বৃক্ষ ছিলো, ফুল 'পাখি' লতা ছিলো
বিবর্ণ, বন্ধনহীন;
মধ্যে আমি।'[১৪৫] (প্রত্নজীব)

'ওরাং' বলতে সাধারণত বৃক্ষবাসী বানরের এক বিশেষ প্রজাতিকে বোঝানো হয়। কবি এখানে সচেতনভাবেই 'ওরাং' শব্দটি ব্যবহার করেছে। কারণ জিনগতভাবে মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে এই বানর প্রজাতির। মানুষের মতো অরণ্যধ্বংসের যজ্ঞে সামিল হয়নি বলেই আজও এই প্রত্নজীবেরা বৃক্ষকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে, অথচ সবচেয়ে উন্নত জীব মানুষ আজ আশ্রয়হীন। 'পৌরাণিক ঘ্রাণ' শব্দবন্ধে কবি তপোবন-কেন্দ্রিক ঋষিদের জীবনকে ছুঁতে চেয়েছেন। পৌরাণিক যুগে ঋষিরা বনবাসী হয়েও কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। আর আধুনিক মানুষ আজ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞাননির্ভর। যন্ত্রের আগ্রাসনে অনেকাংশে সে আজ নিজেই সমাজে অপ্রয়োজনীয়। ঐতিহ্য বলতে কেবল তথাকথিত উন্নত নাগরিক জীবনের সংস্কৃতি বোঝায় না। আদিবাসীদের অরণ্যজীবনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিও বোঝায়। একালে অলকা নন্দিতার মতো অনেক কবির লেখায়

যন্ত্রসভ্যতার সংকটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই আরণ্যক ঐতিহ্যকে তুলে আনবার প্রয়াস দেখা যায়।

কবি চঞ্চল আশরাফ মর্ত্যে মানবজীবনের কার্যকলাপকে গ্রিক পুরাণের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। গ্রিক পুরাণে দেবতাদের দ্বারা অভিশপ্ত চরিত্র ছিলেন রাজা সিসিফাস। দেবতারা সিসিফাসকে চিরকাল একটা পাথর পাহাড়ের চূড়ায় ওঠানোর শাস্তি দেন, যেখান থেকে পাথরটা নিজের ভারেই আবার নিচে পড়ে যাবে। তারা ভেবেছিলেন যে অর্থহীন আর হতাশাজনক শ্রমের চেয়ে ভয়ানক শাস্তি আর নেই।[১৪৬] কিন্তু এই শাস্তি সিসিফাসের কাছে বিরক্তিকর, একঘেয়ে মনে হয়নি কারণ সে জানত তার মৃত্যুর পরে এই কর্মের অবসান ঘটবে। পরবর্তীতে আলবেয়ার কামুও তাঁর 'মিথ অফ সিসিফাস' প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন যে পাথরটা বারবার নিচে পড়ে যেতে সিসিফাস হতাশ হবেনা, বরং খুশিই হবে। কারণ হতাশ হলে এই জীবন তার কাছে দুর্বিষহ মনে হবে আর তখন আত্মহত্যাই হবে একমাত্র সমাধান। কবির মতে আমাদের মানবজীবনও সিসিফাসের মতো। পাথর গড়িয়ে পড়তে দেখে আমরা জীবনের অর্থহীনতা অনুভব করলেও অন্যান্য ছোট ছোট বিষয় নিয়ে খুশি থাকি। কবিও সিসিফাসের এই শাস্তিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন—

'চূড়ায় উঠবো—একথা তো কখনো বলিনি
কেননা আমিও জানি যে পাহাড় মেঘে ডুবে থাকে
তার শীর্ষ কখনো-বা সমুদ্রেও নেমে যেতে পারে'[১৪৭] (সিসিফাস)

কবি বাস্তবতা দিয়ে জীবনকে বিচার করতে চেয়েছেন। মানবজীবনের উত্থান-পতন একই মুদ্রার দুই পিঠের সমতুল্য। চিরকাল সাফল্যের শীর্ষে থাকা সম্ভব হয়না। মেঘকে কবি মানবজীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মেঘ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করলেও পরে বৃষ্টির আকারে মাটিতে নেমে আসে। তেমনি মানুষও তার কর্মফলের মধ্যে দিয়েই উন্নতির চূড়ায় পৌঁছাতে চায়। তার এই চেষ্টা চিরন্তন। সে ব্যর্থ হলেও ক্ষান্ত হয়না। প্রতিবারই শেষ থেকে শুরু করে। অন্তহীন এই পথচলার মধ্যে দিয়ে জীবনের সচলতাকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন

কবি। লক্ষণীয় যে একালের কবিরা স্বদেশ ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশি মিথের ঐতিহ্যকে অনায়াসে গ্রহণ করেছেন।

কবি জাফর আহমদ রাশেদ চর্যাপদের অনুসঙ্গে নিজের প্রেমজীবনকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। চর্যাগীতির ১০ সংখ্যক পদে দেখা যায় সিদ্ধাচার্য কাহ্ন পা ডোম রমণীকে সঙ্গিনী হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। ডোম রমণী যদি সিদ্ধাচার্যের অনুরোধ রাখে তবে তিনি হাড়ের মালা পরিধান করে কাপালিক হতেও প্রস্তুত। চর্যার এই কবিতাটিকে রূপকার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন কবি। চর্যার যুগে মানুষের সামাজিক জীবনের অত্যাচারজনিত যন্ত্রণা, দুঃখবোধকে হাড়ের মালার রূপকে ব্যবহার করেছেন তিনি। সেই সময়ের নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচারকে তিনি আটের দশকের বাংলাদেশের সামরিক শাসনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। বিশ্বায়নের যুগে মানুষ আধুনিক চিন্তাভাবনার শরিক হলেও, সমাজের চোখে কলঙ্কিত নারীকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে। তার গায়ে অস্পৃশ্যতার তক্‌মা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক মানুষের এই দ্বিচারিতা মানতে পারেন না কবি। তাঁর কাছে প্রেম মুখ্য, প্রেমিকার শরীর নয়। তাই তাঁর প্রেমকে সম্মান জানাতে তিনি এই পচাগলা সমাজ ত্যাগ করে এক নতুন জগতের সন্ধান করেন—

> ‘সর্বস্ব ছাড়বো আমি, আমার নির্বাণ হবে তোমার ভিতর।
> নগরের বাইরে গিয়ে বাঁধবো স্বপ্নের ঘর টিলার ওপর।।’[১৪৮] (প্রেয়সী অস্পৃশ্যা হলে)

চর্যাপদে সে-কালের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির যে আভাস পাওয়া যায় তা হল চর্যার যুগে ডোম, চাঁড়াল, শবর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের জনজাতি নগরের বাইরে, জনপদের প্রাণকেন্দ্র থেকে বহুদূরে জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের গুহায় কিংবা মালভূমিতে বসবাস করত। ব্রাহ্মণরা তাদের স্পর্শে সমাজজীবন কলুষিত করতে চাইতেন না বলেই এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[১৪৯] আলোচ্য কবিতাংশে কবি বাংলাদেশকে নিজের প্রেমিকা রূপে কল্পনা করেছেন। সমগ্র আটের দশকজুড়ে সামরিক শাসনের অত্যাচারে বাংলাদেশ তার সমস্ত সজীবতা হারিয়ে সম্মানহারা প্রেমিকায় পরিণত হয়েছে। নয়ের দশকের নতুন

প্রজন্মের কবিদের কাছে এই রিক্ত, নিষ্ফল, সম্ভাবনাহীন বাংলাদেশ গ্রহণযোগ্য নয়, ঠিক প্রত্যাখ্যাত অস্পৃশ্য ডোম রমণীর মতো। কিন্তু নিম্নবর্ণের হলেও কবি কাহ্ন পা যেমন অস্পৃশ্য ডোমনীকে নিয়েই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছেন তেমনি কবি জাফর আহমদও সমাজের পঙ্কিলতা থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করে বসবাসযোগ্য সুস্থ সমাজে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

তপন বাগচীর কবিতায় ভোগবাদী বাংলাদেশ 'কংস-কারাগার' রূপে উঠে এসেছে। পুরাণে আমরা দেখি অশুভ শক্তির বিনাশ, সাধুর পরিত্রাণ এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে রোহিণী নক্ষত্রের অষ্টমী তিথিতে কংসের কারাগারে, পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মথুরার রাজা কংসের অত্যাচার থেকে পৃথিবীর মানুষকে মুক্ত করার জন্যই কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। নয়ের দশকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কবি দেখেছেন ভোগবাদী সমাজে কেবলই লোভ, পাপের হাতছানি। অশুভ শক্তির উত্থানে প্রতিমুহূর্তে সমাজে সত্য-সুন্দরের অপমৃত্যু ঘটছে। কংস যেমন দেবকীর প্রথম ছয়টি সন্তানকে হত্যা করেছিল নিজের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখতে, তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারাও সাত-সাতটি সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেননি। কিন্তু কবি মনে করেন এভাবে গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব নয়। দেবকীর অষ্টম সন্তান হিসাবে আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণ যেমন কংসকে হত্যা করে পৃথিবীতে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি কবিও মনে করেন অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবেই। তাঁর সেই আশার প্রতিফলন ঘটেছে কবিতায়—

'বোনের পায়ের ধুলোয় পুণ্য হলো কংস-কারাগার
আমার আঠারো বোন শিক্ষাশান্তিদূত
জননী দেবকী আহা সর্বংসহা প্রিয় বাংলাদেশ
অষ্টম গর্ভের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'[১৫০] (নীলিমা আমার বোন)

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেননি। এই সময় তিনি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই চুক্তিকে তাঁদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। কেবল পুরাণ নয়, বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামোর অবক্ষয়কে তুলে ধরার জন্য কবি ধর্মীয় মিথের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তুলে এনেছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের চিরাচরিত নৌকাখণ্ডের ঘটনাকে। নৌকাখণ্ডের পুরো ঘটনাই বড়াইয়ের মস্তিষ্কপ্রসূত। দানখণ্ডে রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার দীর্ঘদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন এবং বড়াইয়ের শরণাপন্ন হন। বড়াইয়ের চক্রান্তেই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় রাধার সঙ্গে মিলনের সুযোগ পায়। বাংলাদেশও যেন কবির কাছে রাধিকার মতো অসহায় হয়ে ধরা দিয়েছে। তাই কবি বলেছেন—

'কে গো তুমি ভাণ্ড হাতে মূর্তিমতী মরণবিলাসী
আমার হৃদয়গাঙে ঝাঁপ দাও শুভ্রা অনামিকা
ননীচোর কানু আজ দুঃসাহসী পারের কাণ্ডারী
ডোবে নৌকা, মধুভাণ্ড, ডোবে না রাধিকা।'[১৫১] (নৌকাকাণ্ড)

কৃষ্ণ যেমন নিজের কামনার পরিতৃপ্তি ঘটাতে বারবার রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তেমনি বছরের পর বছর রাষ্ট্রশক্তি নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে বাংলাদেশকে শোষণ করে চলেছে। তাদের অত্যাচারেই বাংলাদেশ আজ নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। এই সর্বহারা বাংলাদেশকে রাধা-কৃষ্ণের অনুষঙ্গে ব্যবহার করেছেন একাধিক কবি—

১) 'আয়ান ঘোষের স্ত্রীর শ্রীমতী রাধার
বাঁধা ছিল দুই হাত দিবস রজনী
অসহায় শৃঙ্খলের নিশীথ আঁধার...
প্রতারিত হলো রাধার তাপিত যৌবনে

দুদিকে অবলা নারী   প্রেমের কারণে'[১৫২] (আয়ান ঘোষের স্ত্রী)

২) 'কার সাথে কও গো কথা, লো রাধা
সেই কবে গেছে কৃষ্ণ বিরহশ্মশানে
আর তুমি করো না গো কৃষ্ণজলে স্নান
জটাচুল ধুয়ে করো চেলোমদ পান'[১৫৩] (লো রাধা)

কবি পরিতোষ হালদার নিজের প্রেম বাসনাকে চর্যাপদের যুগের সাধনতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে বাংলাদেশের পবিত্রভূমি আর প্রেমিকা এক হয়ে গেছে। সমগ্র নিখিল আকাশে কবি তাঁর প্রেমের ব্যাপ্তি টের পেয়েছেন। সমগ্র কালচেতনা যেন কবির কাছে নৈঃশব্দ্যের ছন্দের তালে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতিও তার লজ্জা ভুলে কবিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এই আহ্বান কবি ফেরাতে চান না। তাই বলেন—

''দশমী দুয়ারে স্মৃতিহীন কামাখ্যা আগুন
চৌষট্টি কলা আজ পবন পবন
সাঁই সোমলতা রস দাও
সাঁই আমি তুমি হতে চাই''[১৫৪] (সাঁই রাত খুলে দাও)

'দশমী দুয়ার', 'চৌষট্টি কলা' 'সোমলতা' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে কবি নিজের মিলনাকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ছিল অমর হওয়ার। বৈদিক যুগে সোমলতা থেকে নির্গত সোমরস পান করলে নিজেদের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলেই বিশ্বাস করতেন মুনিঋষিরা। কবিও তাই নিজের প্রেমজীবনকে অমর করে রাখার জন্য সোমরস পান করতে চেয়েছেন।

কবি মতিন রায়হান মনসামঙ্গলের পরিচিত অনুষঙ্গকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের দুরবস্থা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মর্ত্যে দেবী মনসার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য দরকার ছিল চাঁদ সদাগরের পূজা। কিন্তু প্রাথমিকভাবে চাঁদ সদাগর তাতে রাজি না হওয়ায় প্রতিশোধপরায়ণা মনসার অভিশাপে বিবাহের বাসররাত্রে সর্পদংশনে প্রাণ হারান চাঁদের

কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর। এই অকাল মৃত্যু চাঁদ সদাগরের সংসারে যে বিপর্যয় বহন করে এনেছিল তাকে সমকালের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন কবি—

‘হায়রে মনসাদেবী, কি যে শাপ দিলি, ভেলা ছোটে
সদাগর চাঁদ দেখে পুত্রহীন শূন্যবাড়ি আজ
হাহাকারে বুক ভাসে, নেমে আসে অন্ধকার সাঁঝ
নদীর উজানিস্রোত বেহুলায় বুক হয়ে ওঠে।’[১৫৫] (বেহুলামঙ্গল)

শোকের পরিমণ্ডলে কবি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নিষ্ফলতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশের জনগণ। কিন্তু স্বদেশের যে চিত্র জনগণের সামনে উঠে এসেছে তা প্রধানত দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থপর, রাজনৈতিক শাসকদের কুক্ষীগত। যেখানে পূর্ব-প্রজন্মের গৌরব যেমন নেই, তেমনি বর্তমানের হানাহানি, নৈরাজ্যের মধ্যে কোনো সুস্থির স্বপ্ন গড়ে ওঠে না। গণতন্ত্র মৃত। চাঁদপুত্র মৃত লখিন্দরকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। চাঁদের সংসারে সে-দিন যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, গণতন্ত্রের অপমৃত্যুতে নয়ের দশকের বাংলাদেশে বিরাজ করছে সেই স্তব্ধতা। কেবল মতিন রায়হান নন, বাংলাদেশের অনেক কবি মনসামঙ্গলের চিরাচরিত অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন—

১) ‘এ সন্দেহমুক্ত হতে বংশকাহিনী যারা পাঠ করে গেল
তারা দেখে পিতা বা প্রপিতামহ আলস্য করেনি কেউ
মনসা-পূজায়
তবে হই অভিশপ্ত কাহার সন্তান?
দেহকাণ্ডে যত বিষ, তার মর্মে নীল হয়ে যাবে বলে
সংলগ্নজনেরে বড়ো দূরে যেতে বলি’[১৫৬] (বিষ)

২) ‘চাঁদ স’দাগর নিঃস্ব হলো সেই সে কবে
পুত্র ম’লো পুত্রবধূ ভাসালো ভেলা

ভীষণ-উজান দুর্বিপাকে ভাসি একেলা'[১৫৭] (উজানগীত)

৩) 'গাঙুর-বুকে বসত করি একা
ভয় করি না রুদ্র ভয়াল সাগর
মা মনসা রোজ দিয়ে যায় দেখা
আমার কোলে ঘুমায় মরা নাগর।'[১৫৮] (ঢেউয়ের ফণায়)

৪) 'আমি যেন কলাগাছ   ভাসছি
বুকের মাঝে বসে আছেন বেহুলা
বড় ভালো হতো, জন্ম যদি হতো বেহুলাপ্রবণ কলাগাছ হয়ে'[১৫৯]
(আমি কলাগাছ)

কবি নাজনীন সীমন একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার সাক্ষাৎ পেতে চেয়েছেন। নিষ্ফল সমাজ-কাঠামোয় জীবন ধারণ করতে করতে কবি-আত্মা আজ যন্ত্রণাদগ্ধ, নিঃসঙ্গ, একাকী। তাই তিনি বলেন—

'তারপর প্রলেপ লাগানো কষ্টে হাত দিতে বুঝে
যাই হ্যামিলনের বাঁশীওয়ালা হয়ে
যাবতীয় দুঃখ শুষে নিচ্ছ
সুগভীর যন্ত্রণার নির্জন চাতালে বসে।'[১৬০] (বহুদিন পর)

কবিতাংশটিতে বাঁশিওয়ালা কবির যন্ত্রণামুক্তির পথপ্রদর্শক হিসাবে উপস্থিতি হয়েছে। তবে কেবল নাজনীন সীমন নয়, সুমন সরদার-এর কবিতায়ও উঠে এসেছে হ্যামেলিনের বংশীবাদকের অনুসঙ্গ--

'এইদিকে নামে মানুষের ঢল
আহা! যেন হ্যামিলনের প্রাচীন বংশীবাদক
ডাকে আয় আয়!
শুরু হয়ে যায় উল্টো-যাত্রা

পথ প'ড়ে থাকে পথের মায়ায়!''[১৬১] (মানবযাত্রা: দুই)

সামাজিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সমাজে একসময় কড়ির প্রচলন ছিল। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সেই সময় শহরে স্বর্ণ বা রৌপ মুদ্রার প্রচলন থাকলেও গ্রামঞ্চলে কড়ির প্রচলন ছিল বেশি। মুঘল ও সুলতানি আমলে কড়ির মাধ্যমে কর প্রদান করা হত। আজকের সমাজ অনেক উন্নত। সেখানে কড়ির প্রত্যক্ষ ব্যবহার না থাকলেও থেকে গেছে কড়ির অনুষঙ্গ--

'বৃথা কড়ি গুনে তবু পৌঁছে গেছি তোমাদের বাড়ি।
অভ্যাসের দাস বলে যে কথা-দ্রোহপর্বে
আমরা তার মানিনি কণাও আজ বুঝি
এ-ও এক লক্ষহাত সংসারের রূপ''
উনুনগাত্রের কাছে ভুই ও লাকড়ি হাতে তোমার আঙুল
অযথাই আমি খুঁজি পন্থময় বাঁশের করুল'[১৬২] (ঘোরগ্রস্ত দিন)

আজও সমাজে টাকা অর্থাৎ অর্থের মূল্যই শেষকথা বলে। কড়ি বর্তমান সমাজে বিত্তের সূচক। অর্থের প্রতিপত্তিতেই মানুষ নিজের অপূর্ণ কামনাকে চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়। আফ্রিকায় দাসপ্রথার যুগে কড়ির মাধ্যমে কিনে নেওয়া হত একজন মানুষকে, তার মনুষ্যত্বের কোনো দাম ছিল। আধুনিক সমাজে দাসপ্রথা না থাকলেও দাসত্ব মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি।

কবি বায়তুল্লাহ্ কাদেরী বর্ষা ঋতুর প্রেক্ষাপটে গ্রীক পুরাণের ট্রয়যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বর্ষাকে কবি তুলনা করেছেন হেলেনের সঙ্গে। গ্রীক পুরাণের কাহিনিতে দেখা যায়, প্রাচীন এশিয়ার মাইনরে অবস্থিত ঐতিহাসিক ট্রয় নগরীয় রাজা প্রিয়াম-এর পুত্র প্যারিস ট্রয়যুদ্ধের মূল আয়োজক। রাজপুত্র প্যারিস, গ্রিসের স্পার্টা রাজ্যের রাজা মেনেলাস-এর স্ত্রী হেলেন-এর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিয়ে ট্রয়-নগরীতে পালিয়ে আসেন। এর ফলে স্পার্টা আর ট্রয়ের মধ্যে শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক যুদ্ধ।[১৬৩] এই কাহিনি এতটাই

জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে কেবল হোমার নয় গ্রিক কবি হেরোডটাস, নাট্যকার সোফোক্লেস, রোমান কবি ভার্জিল, ওভিদ সবার কাব্যেই এই কাহিনি স্থান লাভ করেছে। নয়ের কবি বায়েতুল্লাহ্ কাদেরীও বর্ষার আগমন ও ট্রয়যুদ্ধের সম্ভাবনাকে মেলাতে চেয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন--

'বর্ষা কি হেলেন তবে? আয়ুষ্মতী নায়িকা আমার
ট্রাডেজির মূলে? ঘোর দুর্ভাগ্যের মতো তার টিপ
আমার কপাল জুড়ে লালিমা-বিস্তৃত? মৃত্যু আজ
আমাকেই দেখে, দেখে না দেখে কখনো আমার জামার
লাল প্রাণ, ও রঙিন বর্ষা, আমাদের ফ্রেণ্ডশিপ
কঠিন লালের রঙ, মন আমাদের যুদ্ধ-সাজ।'[১৬৪] (বর্ষা : ০৯)

ট্রয়যুদ্ধের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি মাত্র নারী হেলেন। তার রূপ সৌন্দর্যের কারণেই এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটেছিল। আর বর্ষার রূপে মগ্ন কবি প্রকৃতিতে যেন সেই যুদ্ধের স্পন্দন অনুভব করছেন। বর্ষা হেলেন-এর মতো কবির হৃদয়ে আলোড়ন তুললেও মেঘের গর্জন এবং বজ্রপাত যেন সেই যুদ্ধের রূপকল্পে হাজির হয়েছে। বর্ষাসিক্ত কবি যেন যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তভেজা সৈনিক। তাঁর সেই বিরহই কবিতাটির মূল উপজীব্য।

মহাভারতের যুদ্ধকাহিনি বাঙলি জনজীবনে বরাবর গভীর ছাপ রেখেছে। এই মহাকাব্যের বিশালতা ও ব্যাপ্তি জনজীবনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে বলেই, এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ আজও অমলিন। যুগ বদলায়, সমাজ বদলায় কিন্তু মানুষের কলহের অবসান ঘটে না। তাই মহাভারতের কলহকে বর্তমানের হানাহানির প্রেক্ষপটে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে রূপদান করলেন কবি রিষিণ পরিমল—

'ভয় নেই; মাত, আমার কুন্তী জননী
আগুনে ভস্ম হলে প্রচল পৃথিবী
মানুষের মূল্য দেবে নতুন ধরণী
আমারও শব্দ আছে তূণে অগ্নিবাণ

আলো ও আঁধারের নাইবা সমান যুঝি

তথাপি যুদ্ধযাত্রা নির্ভীক আমৃত্যুআপ্রাণ'[১৬৫] (আমৃত্যু যৌবনগান)

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী কুন্তী মথুরার যাদববংশীয় রাজা শূরসেনের কন্যা, কুন্তী-ভোজের পালিত কন্যা ও হস্তিনাপুরের রাজা পাণ্ডুর স্ত্রী। কুন্তীর পাঁচ সন্তান যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে খ্যাত। নকুল ও সহদেব যমজ এবং সহোদর। এঁরা কুন্তীর সতীন মাদ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেও কুন্তী তাঁদের আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। এছাড়া সূর্যদেবের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হয়েও ভাগ্যচক্রে তিনি কৌরব রাজকুমার দুযোর্ধনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটনাচক্রে তিনি অঙ্গরাজ হয়ে কৌরবদের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধের সময় তাঁর রথের চাকা মাটিতে বসে যাওয়ায় এবং পরশুরামের অভিশাপে যুদ্ধবিদ্যা ভুলে যাওয়ায়—তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করেন অর্জুন। বর্তমান যুগের বিচারে কবির মনে হয়েছে একপ্রকার অন্যায় যুদ্ধে প্রতারণা করেই কর্ণকে পরাস্ত করা হয়েছে। তাই তিনি কর্ণকে সমর্থন করে নিজেকে তাঁর দোসর বলে অভিহিত করেছেন। কর্ণ ছিল সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক। কিন্তু কবির পক্ষে তীর, ধনুক নিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি শব্দকে অবলম্বন করে শব্দযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আজকের কুরুক্ষেত্রে একদিকে কবি কর্ণের মতো একা, অন্যদিকে রয়েছে বাংলাদেশের শাসকপক্ষ। যারা সমাজ-কাঠামোর ভিতকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই কুন্তীরূপী বাংলাদেশকে কবি রক্তের বিনিময়ে নতুন পৃথিবী নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন। কেবল রিষিণ পরিমল নয়, একাধিক কবিতায় কর্ণ-কুন্তী প্রসঙ্গ উঠে এসেছে—

১) 'যৌবনের যতুগৃহে দ্রৌপদীর দীপ্র প্রত্যাখ্যান

আগুন জ্বালায়;

অনিঃশেষ পোড়ে

একদিন বিনয়ী আর

প্রতিদিন দুর্বিনীত

কর্ণ, সূতপুত্র।'[১৬৬] (অস্থিতে আগুন)

২) 'মাটিতে অর্ধেক ডুবে থাকা
রথের চাকার গোয়ার্তুমি কীভাবে শরীরে জাগে!'[১৬৭] (লীলাচূর্ণ : ০২)

মহাভারতের মতো রামায়ণের কাহিনিকেও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন শামীম কবির। রামায়ণের মুনি ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনিকে কবিতায় তুলে এনে তিনি বললেন—

'আজ অতি মাহেন্দ্রক্ষণে পাত্রবান
ঘষা ও ঘর্ঘর স্বরে
উপকথা বলে যায়
'আর জন্ম নেবে না তো ঋষ্যশৃঙ্গ'
তার মস্তকেও হরিণতা ছিলো'[১৬৮] (জলপান ও ঋষ্যশৃঙ্গের গল্প)

রামায়ণের আদি খণ্ডের কাহিনি অনুসারে বিভাণ্ডক মুনির পুত্র হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। উর্বশীকে দেখে কামার্ত বিভাণ্ডক মুনির শুক্র স্খলন হলে এক তৃষ্ণার্ত হরিণ সেই শুক্র পান করে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করেন। এই মুনিপুত্রের মস্তকে হরিণের মতো একটি শিং ছিল বলেই তার নাম হয় ঋষ্যশৃঙ্গ। বস্তুত ঋষ্যশৃঙ্গ ক্ষণজন্মা তো ননই, তিনি বিভাণ্ডক মুনির পাপাচারের ফল। যে পাপাচারের জন্য তৃষ্ণার্ত হরিণ বাধ্য হয়েই শুক্র পান করে পিপাসার নিবৃত্তি ঘটিয়েছিল। ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ জন্ম-বৃত্তান্ত রামায়ণের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। কবি জানেন আজকের বাংলাদেশের ঋষ্যশৃঙ্গরূপী সমাজও বিভাণ্ডক মুনির মতো সমাজের মুনাফাখোর কিছু মানুষদের পাপাচারের ফল। তাই বাংলাদেশে গণতন্ত্র মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। কবি চান না বাংলাদেশের জনগণ যেন লালসার ফাঁদে পা দিয়ে নতুন কোনো বধ্যভূমি তৈরি করে। সে-জন্য ঋষ্যশৃঙ্গের গল্প শুনিয়েছেন কবি।

রামায়ণে কাব্যের যে জন্মকথার ইতিহাস আছে সেখানে দেখা যায় কামমোহিত ক্রৌঞ্চ (বক) হত্যার শোকে বাল্মীকির মুখ থেকে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমঃ।'—বাক্য আপনা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। এই শোকার্ত বাক্যকেই শ্লোক হিসাবে

অভিহিত করেছিলেন মহাকবি বাল্মীকি। এই শ্লোকই কাব্যের আদিরূপ। যার কেন্দ্রে রয়েছে জীবহত্যার ইতিহাস। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কবিরও মনে হয়েছে প্রতিটি সৃষ্টির মূলেই রয়েছে জরা-মৃত্যু, যা কবিকে নতুন রচনায় উৎসাহিত করে। সমাজ-সংসারের অবক্ষয় থেকেই জন্ম হচ্ছে কবিতায়। কবির অন্তরাত্মা যেন সেই ধ্বংসের ইতিহাস জানতে চেয়েছেন কবির কাছে—

'মা নিষাদ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে—
প্রতিটি পঙ্‌ক্তি রচনার আগে
তুমি হত্যাদৃশ্য দেখ কি-না?'[১৬৯] (দুধগাছ)

কবি সৌমিত্র দেব বর্তমান যুগের মানবসভ্যতার বিপর্যয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য দুর্বাসা-শকুন্তলার অভিশাপ বৃত্তান্তটিকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। পতিধ্যানে মগ্ন শকুন্তলা দুর্বাসার যথাযথ সেবা না করার জন্য, শকুন্তলাকে দুর্বাসা অভিশাপ দিয়ে বলেছিল, যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে শকুন্তলা দুর্বাসার সেবা করল না সেই যথাসময়ে শকুন্তলাকে বিস্মৃত হবে। বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞানের অপব্যবহার যেন দুর্বাসার শাপ হয়েই মানবজীবনে বিপর্যয় নামিয়ে এনেছে—

'দুর্বাসা মুনির মতো হয়তো বা কারো অভিশাপে
বুদ্ধি ব্যবহারে আজ মানুষেরা লড়ে পরস্পরে।
নিজেদের তৈরি অস্ত্রে নিজেরাই প্রাণ ভয়ে কাঁপে
অরণ্যশ্বাপদ নয়, বৈরী আজ প্রতি ঘরে ঘরে।'[১৭০] (আমি সেই
মাতাল যুবক ২)

বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে করতে মানুষ আজ আধুনিক, সভ্য সমাজের প্রতিনিধি। কিন্তু দৈনন্দিন চাহিদা আর লোভের পাপে মানুষ আজ বিজ্ঞানকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে উদ্যত হয়েছে। সে তৈরি করেছে প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র। সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে একে অপরের সঙ্গে। এই সংঘর্ষ যেকোনো মুহূর্তে পৃথিবীকে সংকটের মুখে ফেলতে পারে। মানুষ

যেন সব বুঝেও অসহায়। কারণ প্রকৃতির সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে টিকে থাকা মানুষ নিজকর্মদোষে নিয়তির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে।

তবে কেবল মিথ-পুরাণের কাহিনি নয়, সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা লোককথা ও লোকসংস্কারকেও কবিতার উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের কবিরা। কবি মুজিব ইরম তাঁর 'আঁতুড়ভয়' কবিতায় সেই রকম একটি বিষয়কে তুলে ধরেছেন—

'জন্মের আগেই জন্ম হলো ভয়। তাবিজ-কবজ দিয়ে সাজানো পুলি। ভাঙা লাঙল
আর ছেঁড়া জাল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী হাসে দরজায়। কান্নার কাছেই ছিলো পিতার
আজান।'[১৭১] (আঁতুড়ভয়)

প্রাচীন কাল থেকেই সমাজে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজের মতো অন্ধ-সংস্কার ও বিশ্বাস ব্যাপকহারে প্রচলিত। নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষকে তাবিজ-কবজ দিয়ে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। আর বিপদগ্রস্ত লোকজন এইসব ব্যবহার করে বিপদ থেকে উদ্ধার পান—এমন ধারণা আবহমানকাল ধরেই আমাদের সমাজে বদ্ধমূল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও মানুষের মন থেকে এই সমস্ত কু-সংস্কার নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। আলোচ্য কবিতায় সদ্যোজাত শিশুকে রক্ষা করার জন্য তাবিজ-কবজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে দুটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করে কবি এই তাবিজ-কবজ ব্যবহারকারী মানুষদের একটা সামাজিক পরিচয় নির্দেশ করতে চেয়েছেন। 'ভাঙা লাঙল' এবং 'ছেঁড়া জাল' শব্দবন্ধ দুটি কবি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। আসলে কৃষক-জেলের মতো সমাজের একেবারে নিম্নস্তরের মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের মৌলিক সুযোগগুলি গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না। তারা কেবল অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবি থেকে বঞ্চিত তা নয়, শিক্ষার আলোটুকু পর্যন্ত তাদের ঘরে পৌঁছোয় না। সে-কারণে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় তাবিজ-কবজের সংস্কার। আর নবজাতক শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে পিতার একমাত্র সম্বল হয়ে ওঠে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আজান। বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে এই সামাজিক বৈষম্য মেনে নিতে পারেন না কবি মুজিম ইরম। তাই 'ধোঁয়ার কুণ্ডলী'র অনুসঙ্গ ব্যবহার করে তিনি অসহায় মানুষগুলির প্রতি রাষ্ট্রের এই উদাসীনতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে কু-সংস্কার আর ঐতিহ্য এক

নয়। যে বিধিনিষেধগুলি পরবর্তী জীবনকে, পরবর্তী প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করে তাকেই সদর্থক রূপে চিহ্নিত করে বলা যায় ঐতিহ্য। যদিও আধুনিক কালে বৃত্তবান মানুষরাও এই কু-সংস্কারের শিকার তবে সমাজের দরিদ্রবর্গের সঙ্গে এই সংস্কারগুলি অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ মানুষের পক্ষে কোনো সময়েই সম্ভব নয়। সেই ঐতিহ্যের উপাদান যেমন গৃহীত হয় পুরাণ থেকে, ইতিহাস থেকে, শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে; তেমনই লোক-সংস্কারও এক ধরনের ঐতিহ্য। বাংলাদেশের কবিদের লেখায় শিল্পের সেই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. মোহাম্মদ হাননান, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৯১'', 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০, পৃ. ৪৯

২. সাহাবুল হক, বায়েজীদ আলম, ''জোট রাজনীতির গতিপ্রকৃতি (১৯৯১-১৯৯৬): খালেদা জিয়ার শাসনামল'', 'বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪', অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪, পৃ. ১৭৮

৩. সাহাবুল হক, বায়েজীদ আলম, ''শেখ হাসিনার শাসনামল (১৯৯৬-২০০১): ঐক্যমত্যের সন্ধানে'', তদেব, পৃ. ১৯৪

৪. সাহাবুল হক, বায়েজীদ আলম, ''ক্রান্তিকালীন নির্বাচন ২০০৮: মহাজোট বনাম চারদলীয় জোট'', তদেব, পৃ. ২২৭

৫. বিমল গুহ, ''ক্রোধের আগুন'', 'নষ্ট মানুষ ও অন্যান্য কবিতা', নির্বাচিত কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১২৮

৬. মতিন বৈরাগী, ''দৃশ্য'', 'বেদনার বনভূমি', নির্বাচিত কবিতা, দেশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬, পৃ. ২১০

৭. তারিক সুজাত, ''আমরা নব্বই-এর সন্তান'', 'সময়কে আমি উল্টো পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছি', কবিতা সংগ্রহ, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৬১

৮. শামীম কবীর, ''ও চাঁদ'', 'নির্বাচিত কবিতা', নভেরা হোসেন, পিয়াস মজিদ (সম্পা.), অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১২

৯. আবিদ আজাদ, ''রাশেদ খান মেনন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর'', 'আমার অক্ষমতার গল্প', কবিতাসমগ্র, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৮৬

১০. মিহির মুসাকী, ''পোকার উত্থান'', 'দুই বাংলার নব্বয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', ওবায়েদ আকাশ, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ১৪০

১১. মোহাম্মদ হাননান, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৯২'', 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০, পৃ. ৮১

১২. ফারুক আলমগীর, ''মধ্যাহ্নে অভিমানহত মুক্তিযোদ্ধা'', 'কবিতা ১০০', অ্যাদন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৫২

১৩. হাসানআল আবদুল্লাহ, ''পর্দা সরে গেছে'', 'আঁধারের সমান বয়স', নির্বাচিত কবিতা, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১৩

১৪. টোকন ঠাকুর, ''মিলনের দ্বন্দ্ব'', 'দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওবায়েদ আকাশ (সম্পা.), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ৯৭

১৫. মোহাম্মদ হাননান, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৯৬'', 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০, পৃ. ৪৫২

১৬. ফারুক আলমগীর, ''ডেট-লাইন ঢাকা, মার্চ'৯৬'', 'কবিতা ১০০', অ্যাডন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৬৭

১৭. হাসানআল আবদুল্লাহ, ''শকুনেরা ভালো আছে'', 'শকুনেরা ভালো আছে', নির্বাচিত কবিতা, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৫

১৮. মোহাম্মদ হাননান, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৯৬'', 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০, পৃ. ৪৩৫

১৯. শামীম কবীর, ''রক্ত'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা নব্বইয়ের দশক', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৯৭

২০. আবিদ আজাদ, ''আমার অক্ষমতার গল্প'', 'আমার অক্ষমতার গল্প', কবিতাসমগ্র, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৬৮

২১. ফরহাদ মজহার, ''এক মধ্যবিত্ত তরুণের জন্য সান্ত্বনা পদ্য'', 'অসময়ের নোটবই', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৫৩

২২. রফিক আজাদ, ''কথা ছিলো'', 'করো অশ্রুপাত', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩৭১

২৩. আলাউদ্দিন আল আজাদ, ''আমি বিজয় দেখিনি'', 'চোখ', কবিতা সমগ্র ২, গতিধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৪২

২৪. ময়ুখ চৌধুরী, ''আমার সন্তান যেন'', 'অর্ধেক রয়েছি জলে, অর্ধেক জালে', ডান হাতের পাঁচটি আঙুল, বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৯২

২৫. মোহাম্মদ হাননান, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৯৯'', 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০, পৃ. ১০১১

২৬. সৌমিত্র দেব, ''আমি সেই মাতাল যুবক ৫'', 'পাথরের চোখ', নান্দনিক, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০, পৃ. ১৬

২৭. সরকার আমীন, ''রানীতান্ত্রিক'', 'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ', কবিতা সংগ্রহ ১', ধ্রুবপদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বিজয় দিবস ২০১০, পৃ. ৬৬

২৮. রফিক আজাদ, ''পয়ারেই করো ধারাস্নান'', 'করো অশ্রুপাত', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩৭৩

২৯. টোকন ঠাকুর, ''ভৈরবী'', 'নার্স, আমি ঘুমোইনি', টোকন ঠাকুরের কবিতা, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩১

৩০. সৈকত হাবিব, ‘‘মুদ্রণ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন’’, ‘শহর যৌবন ও রাত্রি’, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৪, পৃ. ৩৮

৩১. আবিদ আনোয়ার, ‘‘বাইশের লাল ঘোড়া’’, ‘স্বৈরিণীর ঘরসংসার’, কাব্যসংসার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭৭

৩২. শামসুর রাহমান, ‘‘অশনি সঙ্কেত’’, ‘তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি’, কবিতা সমগ্র ৪, অনন্যা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৪, পৃ. ৩৮

৩৩. বিমল গুহ, ‘‘প্রতিবাদী শব্দের মিছিল’’, ‘প্রতিবাদী শব্দের মিছিল’, নির্বাচিত কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৩৩

৩৪. ফারুক আলমগীর, ‘‘ডেট-লাইন ঢাকা, মার্চ’৯৬’’, ‘কবিতা ১০০’, অ্যাডন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৬১

৩৫. মারুফ রায়হান, ‘‘শহীদ জননী, ক্ষমা করবেন’’, ‘নৈঃশব্দের পদধ্বনি’ শত কবিতা সতত কবিতা আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৯

৩৬. আসাদ মান্নান, ‘‘হে অন্ধ জলের রাজা’’, ‘হে অন্ধ জলের রাজা’, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৫৭

৩৭. কামাল চৌধুরী, ‘‘সন্ত্রাস’’, ‘এই পথ এই কোলাহল’, কবিতা সংগ্রহ, বিদ্যাপ্রকাশ, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৮৫

৩৮. ত্রিদিব দস্তিদার, ‘‘যুদ্ধে গুরুদাসী’’, ‘ভালোবাসার শাদা ছড়ি’, কবিতাসমগ্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ১৬৩

৩৯. সরকার আমীন, ‘‘দশক জয়ন্তীতে জনগণের প্রতি’’, ‘রুদ্ধশ্বাস বৈঠকের পর’, কবিতা সংগ্রহ ১’, ধ্রুবপদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বিজয় দিবস ২০১০, পৃ. ৮৮

৪০. রহমান হেনরী, ‘‘সার্কাসমুখরিত গ্রাম’’, ‘সার্কাসমুখরিত গ্রাম’, সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৬৪

৪১. সৌমিত্র দেব, ‘‘আমি সেই মাতাল যুবক ১’’, ‘পাথরের চোখ’, নান্দনিক, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০, পৃ. ১২

৪২. মতিন বৈরাগী, ''মৃত্যুর সংবাদ'', 'অন্ধকারে চন্দ্রালোকে', নির্বাচিত কবিতা, দেশ পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬, পৃ. ২০১

৪৩. শিহাব সরকার, ''এসো আগুনে ও কোরাসে'', 'ব্যাবিলন এক্সপ্রেস', কবিতাসমগ্র ১, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৪৩

৪৪. সুহিতা সুলতানা, ''হন্তারক'', 'হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে বিষঘুম', কবিতাসমগ্র ১, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৮, পৃ. ১৫৪, পৃ. ১৫৪

৪৫. রিষিণ পরিমল, ''বেলে দশকের চিত্র'', 'অন্তঃস্রোতের মানসাঙ্ক', ত্রয়ীকাব্য, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৬, পৃ. ২৭

৪৬. হাসানআল আবদুল্লাহ, ''ডাকবাক্সে সম্ভাবনা'', 'আঁধারের সমান বয়স', নির্বাচিত কবিতা, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৭৯

৪৭. ফারুক আলমগীর, ''কেমন করে বেঁচে আছি এ-শহরে'', 'কবিতা ১০০', অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৬৭

৪৮. আবিদ আজাদ, ''এই শহরে একটা কিছু হবে'', 'খেলনা যুগ ও অন্য একুশটি কবিতা', কবিতাসমগ্র, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪১৬

৪৯. ফরহাদ মজহার, ''কাগজের নৌকা'', 'ক্যামেরাগিরি', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২১২

৫০. মাহবুব সাদিক, ''তৈমুরের ঘোড়া ও কৃপাণ'', 'আদিগন্ত রোদের তিমির', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৭০

৫১. মহাদেব সাহা, ''যদুবংশ ধ্বংসের আগে'', 'যদুবংশ ধ্বংসের আগে', শ্রেষ্ঠ কবিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৬৪

৫২. বিমল গুহ, ''কালো হরফের খাতা'', 'প্রতিবাদী শব্দের মিছিল', নির্বাচিত কবিতা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৫৫

৫৩. হাসানআল আবদুল্লাহ, ''বঙ্গীয় উপনিষদ'', 'আঁধারের সমান বয়স', নির্বাচিত কবিতা, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৯৩

৫৪. আহমেদ স্বপন মাহমুদ, ''নায়ক ৩'', 'প্রেম, মৃত্যু ও সর্বনাম', প্রকৃতি, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩১

৫৫. আসাদ চৌধুরী, ''কাদা নয়, হাঁটুতে রাজ্যের ধুলো'', 'বৃষ্টির সংসারে আমি কেউ নই', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৬১-৩৬২

৫৬. খোকন মাহমুদ, ''মোরা মেহনতি মানুষ'', 'মোরা মেহনতি মানুষ', টুম্পা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম একুশে বইমেলা ২০১৪, পৃ. ২৬

৫৭. মোহাম্মদ হাননান, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৯৬'', 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৬', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০, পৃ. ৪২৫

৫৮. রফিক আজাদ, ''নয়া উদ্যোগ'', 'বিরিশিরি পর্ব', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪০৮

৫৯. মোহাম্মদ হাননান, ''বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৯৬'', 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৯৯০-১৯৯৯', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০০, পৃ. ১০০৭

৬০. মাহবুব সাদিক, ''ঋণখেলাপিদের প্রতি : টাকাগুলো দিয়ে দিন'', 'অনন্ত নক্ষত্র চোখ', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৯২

৬১. রফিক আজাদ, ''ঋণখেলাপির মনস্তাপ'', 'বিরিশিরি পর্ব', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪০৫

৬২. সোহরাব পাশা, ''পালাবদল'', 'আনন্দ বাড়ি নেই', নির্বাচিত কবিতা, সমাবেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৮

৬৩. রহমান হেনরী, ''কৃষিকথা'', 'গোত্রভূমিকাহীন', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৩

৬৪. রফিক আজাদ, ''পরিচয়'', 'করো অশ্রুপাত', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩৭৬

৬৫. আবিদ আনোয়ার, ''অতিশব্দের নীল শিখা'', 'খড়বিচালির বৃক্ষজীবন', কাব্যসংসার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১২৪

৬৬. কামাল চৌধুরী, ''বন্যা ১৯৯৮'', 'ধূলি ও সাগর দৃশ্য', কবিতা সংগ্রহ, বিদ্যাপ্রকাশ, পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৯৯

৬৭. রফিক আজাদ, ''আগাছা কাহিনী'', 'বিরিশিরি পর্ব', কবিতাসমগ্র, অনন্যা, ঢাকা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪২১

৬৮. হাসান হাফিজ, ''মানুষ বড়ো বিপজ্জনক'', 'হৃদয় বড়ো কাঁদছে', কবিতাসমগ্র ১, অনন্যা, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৮৩

৬৯. আবু হাসান শাহরিয়ার, ''আঁতুড়কথন'', 'আড়াই অক্ষর', শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভাষাচিত্র, ঢাকা, প্রথম ভাষাচিত্র সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১২৭

৭০. জাহিদ হায়দার, ''মানুষ আসছে, পালাও'', 'বন্দনা করি অপেক্ষা', নির্বাচিত কবিতা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৬৬

৭১. আবিদ আজাদ, ''ইয়েস স্যার'', 'খেলনা যুগ ও অন্য একুশটি কবিতা', কবিতাসমগ্র, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪১৮

৭২. শোয়েব শাদাব, ''শোষণ'', 'অশেষ প্রস্তর যুগ : দ্বিতীয় পর্ব', কবিতা সংগ্রহ, উলুখড়, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৭৪

৭৩. তারিক সুজাত, ''প্রেসনোট থেকে বাদ পড়ে যাওয়া কিছু অংশ'', 'সময়কে আমি উল্টো পায়ে হেঁটে যেতে দেখেছি', কবিতা সংগ্রহ, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৬৩

৭৪. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ''ঘোড়সওয়ার'', 'যমুনাপর্ব', কবিতা সংগ্রহ, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১১, পৃ. ১৬৫

৭৫. তপন বাগচী, ''এখানে মানুষ'', 'নির্বাচিত ১০০ কবিতা', বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকৈআশ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১৩

৭৬. রিষিণ পরিমল, ''অপরাহ্নে শীতার্ত ভীমপুর'', 'নদীজলে চৈত্রদাহ', ত্রয়ীকাব্য, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৬, পৃ. ৬৯

৭৭. হাসানআল আবদুল্লাহ, ''সময়ের ছড়া'', 'শকুনেরা ভালো আছে', নির্বাচিত কবিতা, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩২

৭৮. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ''বধ্যভূমি থেকে'', 'জন্মবাউল', কবিতা সংগ্রহ, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১১, পৃ. ২২৬

৭৯. বিপ্লব ফারুক, ''কুটচাল'', 'সন্ত্রাসে ছেয়েছে পৃথিবী আমার', পার্ল পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, পৃ. ১৬

৮০. বিপ্লব ফারুক, ''বাংলাদেশ'', তদেব, পৃ. ৪৩

৮১. বিপ্লব ফারুক, ''এই দেশে'', তদেব, পৃ. ৪৮

৮২. তপন বাগচী, ''অসুন্দর নাচে'', 'নির্বাচিত ১০০ কবিতা', বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকৈআশ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৬০

৮৩. রিষিণ পরিমল, ''শোকহীন, স্বপ্নবিহীন'', 'অন্তঃস্রোতের মানসাঙ্ক', ত্রয়ীকাব্য, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৬, পৃ. ১৯

৮৪. সৈকত হাবিব, ''ভাঁড়'', 'শহর যৌবন ও রাত্রি', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৪, পৃ. ২১

৮৫. শাহীন রেজা, ''ন্যুমার্কেট থেকে নীলক্ষেত'', 'নির্বাচিত কবিতা', অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৮

৮৬. শাহীন রেজা, ''ইঁদুর সংকেত'', তদেব, পৃ. ৩৯

৮৭. মাহবুব কবির, ''পিতামহের লাঙল'', 'কৈ ও মেঘের কবিতা', নির্বাচিত কবিতা, ভাষাচিত্র, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৭, পৃ. ৪২

৮৮. তপন বাগচী, ''খোলাবাজার'', 'নির্বাচিত ১০০ কবিতা', বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৩০

৮৯. হেনরী স্বপন, ''কীর্তনখোলা'', 'কীর্তনখোলা', শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৯

৯০. হেনরী স্বপন, ''রেণুমাখা ছাই'', 'জংধরা ধূলি', তদেব, পৃ. ৩১

৯১. হেনরী স্বপন, ''হাইব্রিড ঈশ্বর'', 'কাস্তে শানানো মোজার্ট', তদেব, পৃ. ৩৯

৯২. কামরুজ্জামান কামু, ''দিনরাত্রির গোলকধাঁধাঁ'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা নব্বইয়ের দশক', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৩৪

৯৩. ফরহাদ মজহার, ''প্রেম'', 'অসময়ের নোটবই', শ্রেষ্ঠ কবিতা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৬২

৯৪. আবিদ আজাদ, ''খেলনা যুগ'', 'খেলনা যুগ ও একুশটি কবিতা', কবিতাসমগ্র, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ (বর্ধিত), ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪০৩

৯৫. মাহবুব কবির, ''বৃক্ষ'', 'কৈ ও মেঘের কবিতা', নির্বাচিত কবিতা, ভাষাচিত্র, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৭, পৃ. ২১

৯৬. সৌমিত্র দেব, ''বৃক্ষের শত্রুরা'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা নব্বইয়ের দশক', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১২১

৯৭. ময়ুখ চৌধুরী, ''ফার্নিচার'', 'প্যারিসের নীলরুটি', ডান হাতের পাঁচটি আঙুল, বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৬০

৯৮. আবিদ আজাদ, ''ফাল্গুনে'', 'আরো বেশি গভীর কুয়াশার দিকে', কবিতাসমগ্র, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ (বর্ধিত), ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩২১

৯৯. ময়ুখ চৌধুরী, ''ফার্নিচার'', 'প্যারিসের নীলরুটি', ডান হাতের পাঁচটি আঙুল, বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৬১

১০০. সরকার আমীন, ''শিয়ালের হাসি'', 'নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', রবিউল মানিক (সম্পা.), বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩১

১০১. হেনরী স্বপন, ''আমাদের শো-বিজে'', 'দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', ওবায়েদ আকাশ, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ১৮৪

১০২. কবির হুমায়ুন, ''স্যুয়ে ইউয়েন'', 'নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', রবিউল মানিক (সম্পা.), বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৪

১০৩. নাজনীন সীমন, ''নাম'', তদেব, পৃ. ১২৩

১০৪. কুমার চক্রবর্তী, ''ব্যথা'' 'দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', ওবায়েদ আকাশ, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ৮৪

১০৫. মারুফ রায়হান, ''একুশে ফেব্রুয়ারি ২০০০'', 'শত কবিতা সতত কবিতা', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৭৮

১০৬. মামুন মুস্তাফা, ''কণ্ঠিনালার পাড়ে'', 'দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', ওবায়েদ আকাশ, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ১৩০

১০৭. মাহবুব কবীর, ''স্মৃতিসৌধ'', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

১০৮. সৌমিত্র দেব, ''আমি সেই মাতাল যুবক ৪'', 'পাথরের চোখ', নান্দনিক, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০, পৃ. ১৪

১০৯. হেনরী স্বপন, ''মেয়র-মন্তাজ'', 'কাস্তে শানানো মোজার্ট', শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪৩

১১০. আবদুল হাই শিকদার, ‘‘শয্যা পর্ব’’, ‘আশির দশকের কবিতা’, মাহমুদ কামাল ও মোহাম্মদ আবদুল মাননান (সম্পা.), পলল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৩

১১১. রিষিণ পরিমল, ‘‘পুনশ্চ’’, ‘অন্তঃস্রোতের মানসাঙ্ক’, ত্রয়ী কাব্য, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০০, পৃ. ৩৬

১১২. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ‘‘অনন্ত নাগের গল্প’’, ‘যমুনাপর্ব’’, কবিতা সংগ্রহ, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১১, পৃ. ১৭৮

১১৩. ওমর কায়সার, ‘‘অপহৃত আকাশ’’, ‘‘আশির দশকের কবিতা’, মাহমুদ কামাল ও মোহাম্মদ আবদুল মাননান (সম্পা.), পলল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৪

১১৪. রিষিণ পরিমল, ‘‘বিভাজন’’, ‘নদীজলে চৈত্রদাহ’, ত্রয়ী কাব্য, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০০, পৃ. ৮৪

১১৫. সরকার আমীন, ‘‘নৈরাজ্যবাদ’’, ‘রুদ্ধশ্বাস বৈঠকের পর’, কবিতা সংগ্রহ ১, ধ্রুবপদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বিজয় দিবস ২০১০, পৃ. ৭২

১১৬. হাসানআল আবদুল্লাহ, ‘‘বান্ধবীর চিঠি’’, ‘গোলাপের নাম তুমি’, নির্বাচিত কবিতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৩

১১৭. সৈকত হাবিব, ‘‘মহাশূন্য থেকে ফিরে’’, ‘শহর যৌবন ও রাত্রি’, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৪, পৃ. ১৫

১১৮. মতিন রায়হান, ‘‘নগরায়ন’’, ‘পাতাকাহিনীর খোঁজে’, হাতেখড়ি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৯

১১৯. আহমেদ স্বপন মাহমুদ, ‘‘গোলাঘর’’, ‘আগুন ও সমুদ্রের দিকে’, পাঠসূত্র, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৭

১২০. টোকন ঠাকুর, ‘‘সাদা কবিতা’’, ‘দূরসম্পর্কের মেঘ’, টোকন ঠাকুরের কবিতা, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৬৩

১২১. আবদুল হাই শিকদার, ‘‘স্থিরচিত্র’’, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, নব প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৮৬

১২২. এজাজ ইউসুফী, ‘‘বিবমিষা’’, আশির দশকের কবি ও কবিতা’’, শরীফ শাহরিয়ার (সম্পা.), নিমকাল প্রকাশনা, টাঙ্গাইল, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৭৫

১২৩. আহমেদ স্বপন মাহমুদ, ‘‘ব্যবধান’’, ‘নির্বাচিত বাংলা কবিতা নব্বইয়ের দশক’, সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৮

১২৪. কবির হুমায়ুন, ‘‘গোপন’’, তদেব, পৃ. ৩০

১২৫. মুজিব মেহদী, ‘‘একাগাছের কবিতা’’, তদেব, পৃ. ৮৩

১২৬. মতিন রায়হান, ‘‘যাত্রা’’, ‘নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা’, রবিউল মানিক (সম্পা.), বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৭

১২৭. সরকার আমীন, ‘‘প্রণয়’’, তদেব, পৃ. ৩০

১২৮. রিষিণ পরিমল, ‘‘শাহরিক’’, ‘শীতের অরণ্য জানে ফাল্গুন কতদূর’, ত্রয়ীকাব্য, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৬, পৃ. ১০৬

১২৯. হাসানআল আবদুল্লাহ, ‘‘হতাশার জঘন্য উদরে’’, ‘একবিংশ শতাব্দীর আগে’, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৩

১৩০. ওবায়েদ আকাশ, ‘‘সম্পর্ক’’, ‘দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা’, ওবায়েদ আকাশ, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ৫৯

১৩১. কাজল কানন, ‘‘বৃক্ষের কাছে’’, তদেব, পৃ. ৬৯

১৩২. কুমার চক্রবর্তী, ‘‘স্তব্ধতার সংকেত’’, তদেব, পৃ. ৮৬

১৩৩. হেনরী স্বপন, ‘‘স্বাধীনতা পেয়ে’’, ‘কাস্তে শানানো মোজার্ট’, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভাষা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪১

১৩৪. সৈকত হাবিব, ''পৃথিবীর এইসব রাত্রি'', 'শহর যৌবন ও রাত্রি', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৪, পৃ. ২৩

১৩৫. শাহীন রেজা, ''বিরহের পদাবলী'', 'নির্বাচিত কবিতা', অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫৫

১৩৬. তদেব, পৃ. ৫৫

১৩৭. আহমেদ স্বপন মাহমুদ, ''উদ্বাস্তু'', 'আগুন ও সমুদ্রের দিকে', পাঠসূত্র, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৮

১৩৮. মতিন রায়হান, ''শৈশবের নিরপরাধ ফড়িং'', 'পাতাকাহিনীরষ খোঁজে', হাতেখড়ি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৮

১৩৯. টোকন ঠাকুর, ''নিঃসঙ্গজনক'', 'ঝাঁঝাঁ ঝিঁঝিঁ', টোকন ঠাকুরের কবিতা, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৯০

১৪০. মুজিব মেহদী, ''হারানো কৈশোর ও ভাঙাগান'', 'মমি উপত্যকা', শ্রাবণী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ২০

১৪১. শাহ্‌নাজ মুন্নী, ''সন্ত্রাসী চাঁদের পাগলামী'', 'তৃতীয় ঘন্টা পড়ার আগেই', অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৮

১৪২. আয়শা ঝর্না, ''শীলা দ্যুতিময়'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৭

১৪৩. শিমুল মাহমুদ, ''৩০ সংখ্যক কবিতা'', 'প্রাকৃতঈশ্বর', কবিতা সংগ্রহ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৪, পৃ. ২০৭

১৪৪. মারুফুল ইসলাম, ''নৈঃসঙ্গ'', 'নির্বাচিত কবিতা', অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৪৩

১৪৫. অলকা নন্দিতা, ''প্রত্নজীব'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৭

১৪৬. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (অনূদিত), ''সিসিফাস'', 'গ্রীকপুরাণ কথা', তুলি-কলম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ৩২২

১৪৭. চঞ্চল আশরাফ, ''সিসিফাস'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৩৯

১৪৮. জাফর আহমদ রাশের, ''প্রেয়সী অস্পৃশ্যা হলে'', তদেব, পৃ. ৪২

১৪৯. নির্মল দাশ, ''উপসংহার'', 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'র সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৯৮

১৫০. তপন বাগচী, ''নীলিমা আমার বোন'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৪৮

১৫১. তপন বাগচী, ''নৌকাকাণ্ড'', 'নির্বাচিত ১০০ কবিতা', বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৩৪

১৫২. সরকার আমীন, ''আয়ান ঘোষের স্ত্রী'', 'রুদ্ধশ্বাস বৈঠকের পর', কবিতা সংগ্রহ ১, ধ্রুবপদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বিজয় দিবস ২০১০, পৃ. ৭৯

১৫৩. সৈকত হাবিব, 'লো রাধা'', 'শহর যৌবন ও রাত্রি', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৪, পৃ. ৪৬

১৫৪. পরিতোষ হালদার, ''সাঁই রাত খুলে দাও'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৫১

১৫৫. মতিন রায়হান, ''বেহুলামঙ্গল'', তদেব, পৃ. ৬৮

১৫৬. মোস্তাক আহমদ দীন, ''বিষ'', 'নব্বই দশকের নির্বাচিত কবিতা', রবিউল মানিক (সম্পা.), বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১১৫

১৫৭. রিষিণ পরিমল, ''উজানগীত'', 'শীতের অরণ্য জানে ফাল্গুন কতদূর', ত্রয়ীকাব্য, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৬, পৃ. ১১৯

১৫৮. তপন বাগচী, ''ঢেউয়ের ফণায়'', 'নির্বাচিত ১০০ কবিতা', বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ৩৪

১৫৯. সরকার আমীন, ''আমি কলাগাছ'', 'আত্মহত্যার পরিবর্তে ১ কাপ চা খাও', কবিতা সংগ্রহ ১, ধ্রুবপদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বিজয় দিবস ২০১০, পৃ. ৪৮

১৬০. নাজনীন সীমন, ''বহুদিন পর'', 'নব্বই দশকের নির্বাচিত কবিতা', রবিউল মানিক (সম্পা.), বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২৪

১৬১. সুমন সরদার, ''মানবযাত্রা: দুই'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১১৮

১৬২. মোস্তাক আহমদ দীন, ''ঘোরগ্রস্ত দিন'', তদেব, পৃ. ৮৪

১৬৩. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (অনূদিত), ''ট্রয়যুদ্ধ'', 'গ্রীকপুরাণ কথা', তুলি-কলম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ১১৯

১৬৪. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, ''বর্ষা : ০৯'', 'বর্ষাতী সনেটগুচ্ছ', শীতাভ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য, কাব্যসমগ্র, লেখাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০, পৃ. ৩১

১৬৫. রিষিণ পরিমল, ''আমৃত্যু যৌবনগান'', 'নদীজলে চৈত্রদাহ', ত্রয়ীকাব্য, বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৬, পৃ. ১১৯

১৬৬. জাফর আহমদ রাশেদ, ''অস্থিতে আগুন'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৪৩

১৬৭. মজনু শাহ, ''লীলাচূর্ণ: ০২'', 'নব্বই দশকের নির্বাচিত কবিতা', রবিউল মানিক (সম্পা.), বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৭৭

১৬৮. শামীম কবীর, ''জলপান ও ঋষ্যশৃঙ্গের গল্প'', 'নির্বাচিত বাংলা কবিতা', সুমন সরদার (সম্পা.), র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৯৮

১৬৯. জফির সেতু, ''দুধগাছ'', 'দুই বাংলার নব্বইয়ের দশকের নির্বাচিত কবিতা', ওবায়েদ আকাশ, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ৮৮

১৭০. সৌমিত্র দেব, ''আমি সেই মাতাল যুবক ২'', 'নব্বই দশকের নির্বাচিত কবিতা', রবিউল মানিক (সম্পা.), বিভাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৯

১৭১. মুজিব ইরম, ‘‘আঁতুড়ভয়’’, ‘মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান’, ধ্রুবপদ, প্রথম প্রকাশ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ. ১৫